সুশীল জানার শ্রেষ্ঠ গল্প

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট | কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৬৩

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

সূচীপত্র ॥

কুকুর

রাত শেষ হ'য়ে এসেছে—তবু অন্ধকার কাটে নি।

শেষ বর্ষার ছেঁড়া টুকরো মেঘে অন্ধকার ঘন হ'য়ে আছে আকাশে। সেই ক্ষান্তবর্ষণ অন্ধকারে মহকুমার সদর থানা থেকে বেরিয়ে এল গুটিকয়েক অস্পষ্ট মূর্তি নিঃশব্দে—ঘাড়ে বন্দুক।

ইসমাইল আসছিল আগে আগে। কয়েক পা এসে হুড়মুড় ক'রে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

'হুঁশিয়ার।...'

বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে ইসমাইল উঠে দাঁড়াল

পেছন থেকে টর্চের আলো এসে পড়েছে তিন জনের। কয়েকটা কুকুর সরে গেল আলো থেকে অন্ধকারে। স্ত্রীলোকের আধখাওয়া মৃতদেহ একটা পড়ে আছে ইসমাইলের পায়ের কাছে। তিনটে টর্চের আলো ঝল্‌কে ওঠে তার ওপরে। সেই আলোয় চিনতে পারে সকলে ঃ বোবা বুড়ীটা মরেছে এত দিনে—থানার সুমুখে রাস্তার পাশে বসে থাকতো যে আর মাঝে মাঝে চেঁচাত বিচিত্র শব্দে।

'মাগী মরেছে এইখেনে এসে।' ক্রুদ্ধ ইসমাইল বুটের ঠোক্কর দিতে দিতে সরিয়ে দিল সেটাকে রাস্তার ওপর থেকে।

আবার চলতে সুরু করল ওরা।

পেছন থেকে এক সেপাই ঠাট্টা করে ইসমাইলকে ঃ থানা থেকে বেরিয়েই মাটি নিল ইসমাইল—তাই বোধ হয় ভেবেচিন্তে কর্তারা দূরে কোনো ঝুঁকির জায়গায় আর পাঠাল না তাকে।

গর্‌গর্‌ করে উঠল ইসমাইল। 'মাটি এবার সব বেরাদারকেই নিতে হবে হে।' বিকৃত কটু কণ্ঠে ইসমাইল বলল, 'মেয়েছেলেগুলো মাথা কুটে কুটে মরছে এখেনে—ওদিকে কিন্তু তাল ঠুকছে মরদেরা গাঁয়ে গাঁয়ে। ধান নেই —চাল নেই, যুদ্ধের রসদ বলে সব টেনে নিচ্ছে সরকার। বারুদ হয়ে আছে

সব, ক্ষেপে ছুটে আসবে যখন ··· যাচ্ছিস তো, দেখতে পাবি। মনে পড়ে আর বছরের কথা—ঠিক এমনি দিনে ?'

ইসমাইলের কথার জবাব দেয় না কেউ। নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে চলে। মনে পড়ে সকলেরই—সকলেই ছড়িয়ে ছিল কোনো না কোনো থানায়। পিঁপড়ের সারির মতো গ্রামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চাষাভূষোর দল—ঘিরে ফেললে যত থানা আর সরকারী কর্মশালা। কেটে দিলে টেলিগ্রাফের তার, থামগুলো উপড়ে জ্যাম করে দিলে বড় বড় সড়ক। থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল মিলিটারী ট্রাকের সারি। ফেরিঘাটের যত নৌকো রাতারাতি ডুবিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিলে বাইরের সব যোগাযোগ। জ্বলে উঠল আগুন—অসহায় ভাবে জ্বলতে লাগল পোস্ট অফিস, থানা, মহাফেজখানা।···

তেমন আগুন আবারও জ্বলে উঠতে পারে এবারে দুর্ভিক্ষের শূন্যতায়—বিগত বছরের উদ্‌যাপন দিনকে স্মরণ করে। ধান নেই—চাল নেই, বিত্ত নেই—কাজ নেই, নিরন্নের দল ছুটে আসতে পারে আবার যুদ্ধে ব্যস্ত সরকারী কর্মশালাগুলোর দিকে। ওদিকে ঘুরঘুর করছে জাপানী সন্ধানী উড়ো জাহাজ বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ কোণায়। প্রতিরোধ প্রস্তুতির জন্যে সদর থেকে ছোট ছোট দলে চলেছে শেপাই-শান্ত্রীর দল গ্রাম-গ্রামান্তরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে ওরা।

উৎসুক ইসমাইলের কিন্তু যাওয়া হলো না কোথাও মহকুমা শহর ছেড়ে। ক্ষুব্ধ ইসমাইল চলেছে ওদের সঙ্গে আপশোষ করতে করতে :

···কি আছে এই শহরে !—

আবার একটা। পায়ে ঠেকল। দল্‌দলে। থম্‌কে দাঁড়াল ইসমাইল—বলল, 'জ্বালতো টর্চটা।'

একটা নয়—দুটো।

আধখাওয়া দু-দুটো মৃতদেহ পড়ে আছে ইসমাইলের পায়ের কাছে। একটা বাচ্চা—কচি মাথাটা শুধু আস্ত আছে। আর একটা মেয়ে লোক—বেআব্রু। আধ খাওয়া। দুধের ভাণ্ডার দুটো নিঃশেষ। হয়তো মা হবে। টর্চের আলোয় দূরে সরে যাওয়া কুকুরগুলো গর্‌গর্‌ করে উঠল।

'ইয়া আল্লা ! দে—দেতো বন্দুকটা। শালা কুত্তা।'

'শহরে তো রইলিই ভেইয়া কুকুর মারার জন্যে।' পেছন থেকে এক সেপাই আবার ঠাট্টা করে ইসমাইলকে, 'আমাদের টোটা আর বাজে খরচ করে লাভ কী—সে আমাদের ভারি কামে লাগবে।'

'হুঁ—জরুর, নিয়ে যা—ভারি কামে লাগবে। যাদের ওরা খাচ্ছে

তাদের মরিয়া জোয়ানগুলোর জন্যে লাগবে সেখানে।' ইসমাইলের কথায় বিদ্রূপ আর ক্ষোভ, 'আর কাল থেকে এখানে আমার কুত্তা মারার পালা—এস.ডি.ও. সাহাবের হুকুম হয়ে গেছে আজ। মারো কুত্তা।'

সাংঘাতিক মানুষ-খেকো হয়ে উঠেছে কুকুরগুলো। গ্রামে অন্ন নেই—শহর বড় দুর্মূল্য, হিসেবী আর কঠিন। কুকুরের খাবার দেয় কে? দুর্ভিক্ষের মড়া খেতে খেতে সেগুলো হয়ে উঠেছে হন্যে—বুনো। শহর জুড়ে তাদের রাজত্ব। মড়া না পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্যান্তর ওপরে।

মৃতদেহ দুটোর পাশ কাটিয়ে আবার এগিয়ে চললো সেপাইয়ের দল। ওরা চুপচাপ। কিন্তু ইসমাইল চুপ করে থাকতে পারছে না। মনে তার হাজার কথা, ছটপট করছে বুকের মধ্যে। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা গণেশপ্রসাদ এখন কোথায়?'

'আরি বাপ্‌রে।' এক সেপাই বললে, 'সে এখন জবর অফিসার ভেইয়া—স্পেশাল দারোগা।'

আর একজন বলল, 'মওকা মিললে এবার আরও ভারি অফ্‌সর হোতে পারবে।'

'জরুর।'

ইসমাইল ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাঁটতে লাগল ওদের সঙ্গে সঙ্গে। এল শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। গ্রাম-মুখো সেপাইয়ের দল এগিয়ে চলে গেল গ্রামের পথ ধরে। ইসমাইল দাঁড়িয়ে রইল শুকনো মুখে, কান পেতে শুনতে লাগল অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—কিছু হাসি, কিছু অস্পষ্ট কথা। এলোমেলো অসংখ্য কথা তোলপাড় করে ইসমাইলের মনের মধ্যে। ওরা চলে গেল অনেক দূরে ইসমাইলেরই চেনা জানা এক গ্রামের ঘাঁটিতে—যে গ্রাম পচা একটা ঘায়ের মতো থক্ থক্ করছে ইসমাইলের মনের মধ্যে, সে-গ্রাম থেকে সতীর্থ গণেশপ্রসাদ অফিসার ব'নে গেছে গত বছরের বিক্ষোভের সুযোগে। মনে পড়েঃ সন্ধ্যার অন্ধকার লাল হয়ে উঠেছে আগুনে, দম বন্ধ হয়ে আসে ধোঁয়ায়—জনতার আকাশ ভাঙা হুংকারে বুক কাঁপে—হাত কাঁপেঃ করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। পাশে গণেশপ্রসাদ শুধু নির্মম লক্ষ্য ভেদ করে চলেছে। এক ··· দুই ··· তিন ··· পাঁচ ··· আট। ···দেখতে দেখতে গুণতে ভুল হয়ে যায়। লাস—লাস—লাস।

ভোর হয়ে গিয়েছে। অদূরে ছিটে বেড়ার বিরাট চালা ঘরটার দিকে তাকাল ইসমাইল। শহরের একান্তে সরকারী ওই খাদ্য ভাণ্ডারে রাত্রির পর রাত্রি ধরে পাহারা দিতে হবে তাকে। এদিক ওদিক ছড়ানো সেনাবারিক।

পুবে কোর্টকাছারির কোঠা, এস.ডি.ওর বাংলো। ক্ষিপ্ত জনতা ওখানে ভেঙে পড়বে না কোনোদিনই। আর শ্মশানের মত এই শহর। তার সড়কের এখানে ওখানে মৃতদেহ ঘিরে কুকুরের জটলা। রাতের অন্ধকারে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরন্ন অবসন্ন দেহগুলোর ওপরে—ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সারা রাত। ওই কুকুরগুলোকে গুলী করে মারতে হবে—মনে মনে বলে ইসমাইল, আর তারা চলে গেল দলের পর দল—প্রতিষ্ঠা ··· সুযোগ ··· সতীর্থ গণেশপ্রসাদের পথে।···

ক্ষুব্ধ মনে শহরের দিকে মুখ ফেরাল ইসমাইল।

এমন সময়ে একটা লোক সুমুখে এসে দাঁড়াল তার, মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি—দৃষ্টিতে তার উদ্‌ভ্রান্ত আকুতি।

'সেলাম সিপাইজী।'

ইসমাইল তাকাল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

লোকটা ভয়ে দু-পা পেছিয়ে গেল। আমতা আমতা ক'রে যা ব'ললে, তার অর্থ ঃ সে একটা কাজ চায়। সরকারী খাদ্যভাণ্ডারের গুদামে অনেক কুলি কাজ করে—সারাদিন ধান-চাল বয়। ইসমাইলকে দেখেছে সে সেখানে পাহারা দিতে। যদি একটা কাজ ক'রে দেয় সেখানে ··· স্ত্রী-ছেলেমেয়ে তার না খেতে পেয়ে মরছে।···

ব'লতে ব'লতে লোকটা ইসমাইলের পা চেপে ধরে' মাটিতে বসে পড়ল।

'দয়া করো সিপাইজী। কুলিদের হেডম্যানকে শুধু একটু বলে দিলেই হবে।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে সমস্ত রক্ত যেন মাথায় গিয়ে ওঠে ইসমাইলের। সবল পা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় সে রুগ্ন লোকটাকে রাস্তার এক পাশে। মনে মনে বলে ঃ এরা—এরাই অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে গনেশপ্রসাদকে জীবনের একধাপ উঁচুতে তুলে দিয়েছে। সে-জীবন ইসমাইলের আজ নাগালের বাইরে। শুধু তার সঙ্কীর্ণ জীবনের মধ্যে একটা পশু অন্ধ আবেগে ছট্‌ফট্ করে। লোকটাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয় ইসমাইলের।

···লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন তার ওপর!··· একটা সুযোগ পেত ··· অন্তত একটা ··· না—লোকটা ভয়ে পিছু হটছে। 'ভেড়ীকা বাচ্চা।' একটা গালাগাল দিয়ে ইসমাইল চলে গেল শহরের দিকে। লোকটা সেই দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ—তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদূরের সরকারী গুদামের দিকে এগিয়ে গেল। ধান আর চাল বোঝাই

ট্রাকের সারি এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। কাজ শুরু হ'য়েছে দিনের। হেডম্যান হবিব খাঁর হেপাজতে কুড়ি-বাইশজন কুলি মাল খালাস ক'রছে গাড়ী থেকে। ওজন হচ্ছে বিরাট পাল্লায়। একটি আধবুড়ো কর্মচারী দরজার সুমুখে বসে বসে বস্তার ওজন লিখছে।

কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল লোকটি, অপেক্ষা ক'রতে লাগল হেডম্যান হবিব খাঁ কখন ভেতরে গিয়ে ঢোকে। হবিব খাঁর সামনে এগোতে তার সাহস হলো না।

এক সময়ে সুযোগ এল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াল সে কর্মচারীটির সুমুখে। তারপর যেন এক নিঃশ্বাসে হুড়মুড় করে ব'লে ফেললে তার সব কথা—তার অনশন—তার বৌয়ের কথা, তার ছেলের কথা।

কর্মচারীর মন গলল কিনা কে জানে, জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি তোর?'

'মাধব।'

'আচ্ছা—আসিস্ তবে কাল থেকে। হবিবকে ব'লে দেবো আমি। রোজের ভাগ কিন্তু দিতে হবে আমাকে দু-আনা ক'রে। তুই পাবি আট আনা। রাজী?'

'তাই হবে বাবু।'

আনন্দে মাধবের মুখটা অদ্ভুত এক রকমের দেখায়। দিশাহারা অন্ধকারে হাতে যেন স্বর্গ পেল। কিন্তু হবিব খাঁ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সব এলোমেলো করা উচ্চণ্ডে দম্‌কা হাওয়ার মত। ব'ললে, 'ও কি এই জুলুমের কাজ পারবে স্যার?'

'কেন?'

'ও তো খোঁড়া।'

'চিনিস্ ওকে?'

'এক গাঁয়ের লোক—চিনি বৈ কি। আর বছর স্বদেশী হাঙ্গামার সময় থানা ভাঙতে গিয়ে গুলী এসে লেগেছিল পায়ে। তার পর পালিয়েছিল কোথায়।...'

'পুলিসে ধরে নি?'

তারা ধরে নি মাধবকে—মাধবের মত চাষাভুষোকে। কেন যে ধরে নি —জানে না মাধব। শুধু জানে—গ্রামে খাদ্য নেই, কাজ নেই, সম্বল নেই —বিশ্বসংসার জুড়ে শুধু নেই নেই, আর জীবন জুড়ে নেমে এসেছে আদি-অন্তহীন একটা হতাশা। এই একটা বছরের মধ্যে সংসার তচ্‌নচ্ হ'য়ে গিয়েছে তার—বলদ গিয়েছে, জমি গিয়েছে—খোঁড়া হ'য়ে গিয়েছে

একটা পা। কোনো দাম আজ আর নেই তার। দু-হাতে কর্মচারীটির পা জড়িয়ে ধরল মাধব ব্যাকুল ভাবে :

'বাঁচাও বাবু। মোর ধরম বাপ্ তুমি।'

'আরে ম'লো যা ··· খোঁড়াকে নিয়ে ক'রবো কি! বের ক'রে দে ··· বের ক'রে দে—এই হবিব!···'

কুলিরা ঠেলে ফটকের বাইরে বার ক'রে দিল মাধবকে।

রাস্তার ওপরে মাধব দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ বিহ্বল হ'য়ে। এর পর কোথায় যাবে সে—ভেবে পেল না। মাথার ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। মনে পড়ল না তার গ্রামের কথা, মনে পড়ল না তার ঘরের কথা—মনে পড়ল না একবার, তার ফেরার জন্যে ব্যাকুলভাবে কেউ প্রতীক্ষা ক'রছে। দু-দিন কেটে গেল তার শহরে কাজের ধান্ধায় ঘুরে ঘুরে।

এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল সে বন্দুকের আওয়াজে। তাকিয়ে দেখল, কুকুরগুলো একে একে লুটিয়ে পড়ছে আধ-খাওয়া মৃতদেহগুলোর পাশে—আর সকালের সেই সেপাইটা বন্দুক হাতে এগিয়ে আসছে যেন তারই দিকে। ইসমাইল আসছে। সঙ্গে আরও কয়েকজন সেপাই। হঠাৎ কেমন ভয় হয় মাধবের। সে-ও যেন মরে যাবে ওই-কুকুরগুলোর মত এখ্খুনি। কয়েক মুহূর্ত সে চেয়ে রইল হতাশ ভাবে—যেন নিজেকে বাঁচাবার কোনো ক্ষমতা নেই আর তার। তবু খঁাড়িয়ে খঁাড়িয়ে সে ছুটতে সুরু ক'রল—জীবনের অন্ধ তাড়নায়—যে জীবন মরেও মরে না।

না খেতে পাক—আপাতত ছুটে গিয়ে জীর্ণ কিন্তু জ্যান্ত শরীরটাকে নিয়ে কোথাও লুকোতে চায় সে।

'ময়না!'···

ক'দিন যেতে না যেতে গ্রাম-ঝঁ্যাটানো মানুষের সঙ্গে ময়নাও এসে হাজির—কোলে বছর তিনেকের একটা চামচিকের মতো ছেলে। সরকারী চালগুদামের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ চালিয়ে কাকে যেন খুঁজছে।

আবার দে ছুট—খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিক ওদিক অলিগলি ঘুরে একেবারে শহরের অন্যপ্রান্তে। এ আর এক বিভীষিকা মাধবের।

'গতর দেখ! একটু টস্‌কেছে? মুখটা শুধু যা একটু শুক্‌নো শুক্‌নে ও মেয়ে মানুষ—শোলার জাত, জল পেলে ফের ফুলে উঠবে বাপ্‌রে—দেখতে পেলে আর রক্ষে ছিল! এখুনি হাউমাউ করে বলবে—আর

পারি না গো, মোর বাচ্চাটার মুখে কিছু দাও। ও যে আর কান্‌তেও পারে না গো।'

এক গাছ তলায় বসে হাঁপাতে হাঁপাতে মাধব বিড়বিড় করে, 'মর মাগী! তো আমি কি করবো। আমি ধান চাল লুকিয়েছি! আমি নোনাবানে জমিজিরেত পুড়িয়েছি? হুই হোটেলের পেছনে নন্দমা আছে, আস্তাকুঁড় আছে—হাতড়ে দ্যাখগে যা। হুঁ ঃ।'—

কদিন আর একদম ও-মুখো নয়।

কিন্তু শহরের এ প্রান্ত যে বড্ড শুখা। গরীব গেরস্থের পাড়া। বহুদিন অনেকের বাড়ি থেকে উনুনের ধোঁয়াও ওঠে না। ভাতের ফ্যানটুকুও ওরা ফেলে দেয় না। ও প্রান্তে তবু কোর্ট-কাছারি আছে, বাজার আছে, মোটর ইস্টেশন আছে। বাজারেদের জন্য দু'চারটে সস্তা হোটেল আছে। তিন-তিনটে আস্তাকুঁড় আছে। বাইরের মানুষের কাছ থেকে দু-চারটে পয়সা ভিক্ষেটিক্ষে পাওয়া যায়। জায়গাটা টানে রাতদিন—ময়নাও নয়, তার বাচ্চাও নয়।

লুকিয়ে লুকিয়ে কদিন আর পেটের জ্বালা সইবে। একদিন রাতের অন্ধকারে হাজির হল মাধব হোটেলের আস্তাকুঁড় লক্ষ্য করে। না, অত রাতে আর কেউ নেই। হন্যে কুকুরের ভয়ে সব আস্তানা ধরেছে।

এমনি দু-একদিন যেতে যেতে সাহস হলো মাধবের। ময়নার পাত্তা নেই কোথাও। 'হারামজাদী গেছে—পেটের জ্বালায় গেছে আর কোথাও। কে জানে।...'

আস্তাকুঁড় ঘাঁটা সেরে মাধব আশে-পাশে ঘোরে গুদাম ঘরের! ঘোরে আর কি যেন ভাবে—অসংখ্য এলোমেলো ভাবনা। হায় ভগবান ... হোতা এত খাবার—যদি একবার ঢুকতে পেত। পাঁজরের হাড়গুলো ক্রমশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে দিনে দিনে, মুখের দাঁড়ি গোঁফে কেমন জন্তুর মত দেখায় তাকে।

হঠাৎ একদিন রাত্রির গভীর অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো সেই জন্তুটার। নিঃশব্দ অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সে—ইসমাইলের টর্চের আলো ময়নার মুখে ঝল্‌কে উঠে নিভে গেল। হাসল ময়না, এসে দাঁড়াল গুদামঘরের ফটকের সুমুখে। কোলে কুকলাশের মতো ছেলেটা ঘুমে ঢুলে আছে কাঁধের ওপর। ফিসফিস কথা শোনা যায় না, শুধু দেখতে পেল মাধব—পাশের একটা দোকানের ফাঁকা চালার মধ্যে ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে ময়না ফটকের ভেতরে গিয়ে ঢুকল—মিশে গেল গভীর অন্ধকারে।

মাধব দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো। কপালের কোন মুমূর্ষু শিরাটা যেন দপ্‌দপ্‌ করে উঠল ক্ষণিকের জন্য ঃ ময়না তার বৌ। কোথায় কি যেন একটা ছিঁড়ে গেল—বুকে তার যন্ত্রণা। তার জের মিটতে না মিটতে হঠাৎ সে চমকে উঠল আরও একটা ক্ষীণ আর্তনাদে। গোটা তিনেক কুকুরের চাপা গোঙানিতে সে আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল। অন্ধকারে দেখা যায় না—তবু তার মনে হয়, ময়নার শুইয়ে আসা ঘুমন্ত ছেলেটার ওপরে খেয়োখেয়ি ক'রছে কুকুরগুলো। অসহায় ভাবে মাধব দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। নির্মম সাক্ষীর মত। সে কারুর স্বামী, সে কারুর বাবা! কিন্তু কিছু একটা ক'রতে গেলে সে যেন শান্তিভঙ্গ ক'রবে নিঃশব্দ নিবিড় এই প্রশান্ত রাত্রির। যেন সে অধিকার আর তার নেই। চেঁচিয়ে উঠলে হয়তো সেপাইটা এসে তাকে গুলী করে দেবে। মাধব হঠাৎ ছুটতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—যতটা দূরে পারে। যদি ময়না দেখে ফেলে! ···

কিছুক্ষণ পরে ময়নার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল গুদামঘরের ফটকের ভেতর থেকে। ছেলেটাকে যেখানে শুইয়ে রেখে এসেছিল—সেখানে গিয়ে হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল সে। কুকুরগুলো গ্রাস ভরা মুখে দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ গোঁ ক'রে উঠল তাকে দেখে।

আর দূর থেকে সেই সুগভীর অন্ধকারে কান পেতে শুনল মাধব—যেন একটা কান্না—খুব অস্পষ্ট চাপা একটা কান্নার সুর। বুকের মধ্যে কেমন যেন শির্ শির্ ক'রে উঠল তার—কেমন যেন ভয় পায়।

ইসমাইলও শুনলো সেই কান্না কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হ'য়ে—তারপর তার ভারি বুটের শব্দে চাপা পড়ে যায় সব। পায়চারি করে ইসমাইল আর ভাবে ঃ শুধু মৃত্যু আর দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা ··· কংকালসার বীভৎস মানুষের দল আর নরমাংসলোভী কুকুরের পাল। আর কি আছে এই শহরে! সঙ্গীরা তার চলে গিয়েছে দলের পর দল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ··· সেখানে আছে অর্থ ··· প্রতিপত্তি ··· উন্নতি। গণেশপ্রসাদ অফ্‌সর!··· যেমন ক'রে বেগবান রাঙা বন্যার জলস্রোত হঠাৎ নদীর বাঁকে বাধা পেয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে—তেমনি ক'রে ঘোরে ইসমাইলের অবরুদ্ধ বাসনা।··· এই নিঃশব্দ শহরের প্রান্তে ··· এই খাদ্য-ভাণ্ডারের দিকে কোনো দিন ছুটে আসবে না কেউ। হতভাগা ইসমাইল—কোথাও যাওয়া হ'ল না তার! নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয় ইসমাইল। ছিঃ ছিঃ—কেন সেদিন সে গুলী চালাতে পারল না! কেন?

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়নাকে খুঁজে বের ক'রল মাধব। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চাপা গলায় ওরা কি যেন আলোচনা করে। ময়না কাঁদে,—

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। 'সেই তুমি এলে গো—কিন্তু মোর সোনামণি যে নাই।'

মাধব মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'ফ্যাচ ফ্যাচ করে আর সতীপনা দেখাতে হবে না। এখন যা বলি কর। আগে মোদের বাঁচতে হবে।'

এক সময় রাত গভীর হ'ল। ওরা দুজনে এগিয়ে চলল গুদাম ঘরের দিকে। কাছাকাছি এসে থম্‌কে দাঁড়াল মাধব। চাপা গলায় ব'লল ঃ

'এবারে তুই যা। যতক্ষণ পারিস—দেরি করিস।'

মাধব দাঁড়িয়ে রইল। ময়না এগিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়ালো ফটকের কাছে। ইসমাইলের টর্চের আলো ঝলকে উঠল ময়নার মুখে। ময়না ফটক ঠেলে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই হাতে চোখ ঘষে জানোয়ারের মত দেখল মাধব। ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। মাধব পথ ছেড়ে খানিকটা ঘুরে এসে দাঁড়াল গুদামঘরের পেছনে। হাতে শুধু ভাঙা একটা কাটারি—হাত সাফাই করে জোগাড় করেছে কোন গেরস্থ বাড়ি থেকে।

সেই কাটারি ঘষে ঘষে সন্তর্পণে মাধব গুদাম ঘরের ছিটেবেড়া কাটে। মানুষ ঢোকার মত কিছুটা ফাঁক হ'লো ঘষাঘষি করে। এবার ঢুকে পড়লো সে ঘরের মধ্যে। চালের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগে মাধবের। দম যেন বন্ধ হয়ে গেল তার, আর বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। চুরিতে অভ্যাস নেই। ইচ্ছে হলো—একটু জিরিয়ে ধাতস্থ হয়। কিন্তু সময় বড় দুর্মূল্য। বড় পিছল।

বিরাট একটা চালের বস্তা নিয়ে টানাটানি করে মাধব—যেন সেটা একটা পাহাড়। নড়াবার শক্তি তার হলো না।

বস্তার মুখ কেটে কিছুটা চাল ফেলে দিয়ে আবার টানাটানি করে মাধব আর ব্যর্থ হয়ে হাঁপায়। আরও কিছুটা চাল ফেলে দিল সে।

ওঃ ··· এত অপচয়—এই সমস্ত চাল যদি সে নিয়ে যেতে পারত। ··· বস্তাটাকে কোনো রকমে টানা-হেঁচড়া করে বাইরে নিয়ে এল সে। বার কয়েক চেষ্টার পর মাথায় তুলল সেটাকে। তারপর সন্তর্পণে কোনো রকমে এগিয়ে চলল বালির ওপর দিয়ে।

কিছুটা এসে পা টলে—মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার—পায়ের তলার মাটি যেন নাচছে—সুমুখের অন্ধকার পথ হারিয়ে যাচ্ছে গভীরতর অন্ধকারে।

হঠাৎ মাথার বোঝা ছিটকে পড়ল একদিকে—আর মাধব টলতে টলতে

পড়ে গেল মাটিতে। অন্ধকার আকাশ আর পৃথিবী ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে যেন আর এক অন্ধকারে। বহু দূর থেকে কুকুরের ডাক শোনা যায়, আর দ্রুত থর্‌থরে পায়ের শব্দ।

অন্তিম মৌসুমী রাত। অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক। মেয়েটা চলে গিয়েছে। ইসমাইল বিড়ি টানতে টানতে বন্দুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কতকগুলো কুকুর চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল গুদামঘরের পেছন দিকে। ইসমাইল টর্চ জ্বেলে বন্দুক ঘাড়ে এগিয়ে চলল সেইদিকে।

··· কুকুর মারতে হবে তাকে ··· আর তারা চলে গেল দলে দলে ···

মাধবের সিঁদ কাটা জায়গাটায় ইসমাইলের টর্চের আলো ঝলকে উঠল, আর দুলে উঠল তার বুকটা। মুহূর্তে গণেশপ্রসাদের মুখটা ভেসে উঠল তার চোখের সুমুখে। সুযোগ তবে এল! ···

··· অনেক নয় ··· সেই মারমুখী তারা আসবে না এখানে কোনদিন ··· শুধু একটা ··· অন্তত একটাকে গুলী করবে সে ··· এবার আর হাত কাঁপবে না—বুক কাঁপবে না। ···

একটা অতিকায় যন্ত্র যেন বাসনার বিদ্যুৎ স্পর্শে হঠাৎ গর্জন করে উঠল তার বুকের মধ্যে।

টর্চের আলো ফেললে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইসমাইল। কিছু দূরে কয়েকটা কুকুর জটলা ক'রছে। টর্চের আলো ফেলে শক্ত মুঠিতে বন্দুক ধরে' সেই দিকে এগিয়ে গেল সে।

চালের বস্তাটা পড়ে আছে একটু দূরে। কয়েকটা কুকুরের গরগরানি আর ধারালো দাঁতের মাঝখানে ছটফট্‌ ক'রছে একটা লোক।

সেই নিঃশব্দ নিবিড় অন্ধকারে পাশাপাশি দুটি আদেশ ঝল্‌কে উঠল তার মাথায়—কুকুর আর মানুষ। ··· আর অসহায় মৃত্যু! ··· লাস ··· লাস ··· লাস। সব যেন এক নিমেষে গোলমাল হয়ে যায়। কঠিন হাতে বন্দুক ধরে' কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ আর বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইসমাইল: কাকে গুলী করবে সে? মানুষ না কুকুর? তাই তো! ··· না, আজও সে আবার ঠিক করতে পারল না।

পদচিহ্ন। ১৯৪৫

সাঙাৎ

ক্যানেলের ধার ঘেঁষে গুটিকয়েক বুড়ো বট আর অশত্থের ছায়ায় হাট বসে। সপ্তাহে মাত্র দু-দিন হাট। বাকী পাঁচটা দিন গ্রামের মানুষ বড় একটা কেউ পা বাড়ায় না এদিকে। সে-কটা দিন লোকালয় বিচ্ছিন্ন জনহীন জায়গাটা নির্জনতায় ঝিম মেরে থাকে। একটা শূন্য চালানী নৌকো হাটের কাছাকাছি ক্যানেল পাড়ে নোঙর ফেলে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে কাশবনের ভেতরে। সেখানে শুধু তিনটি মানুষের গলা শোনা যায়। তারা রাঁধে, কাঠ চেলা করে, নৌকো ধোয়। কখনো কখনো একটা ভরাট গলা গান গেয়ে ওঠে। অধিকাংশ সময়েই চুপচাপ। তিনটে মানুষ একেবারে চুপচাপ বসে জাল বোনে একান্তমনে। একটি বুড়োটে শুকনো মানুষ—কড়াপাক শণের দড়ির মতো। সে হলো মাঝি বৈরাগী দাস। দুজন দাঁড়ি—ভবানী আর কেদার, জোয়ান ছোকরা। এদের তিনজনকেই চারিদিকের জনমানবহীন নীরবতা আর অচলতা যেন গ্রাস করে ফেলে সম্পূর্ণভাবে। সপ্তাহে মাত্র বার দুই যায় গঞ্জের হাটে মাল আনতে। কনট্রোলের চিনি, কেরোসিন আর বেনেতি মসলা, গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসে নৌকো বোঝাই করে, কখনো গ্রাম-দেশ থেকে নিয়ে যায় পাট আর কুমড়োর চালান। দিনের পর দিন ওদের কাটে নৌকোতেই—নৌকো এদের ঘর-সংসার। ভাসন্ত ঘর। সে ঘরের ওপরে সিঁদুর দিয়ে নাম লেখা : মালিক—শ্রীসদাশিব হাজরা।

সদাশিব নিজে এসে দেখে যায় মাঝে মাঝে—নৌকোর তোয়াজ তদারক ঠিক চলছে কিনা, দাঁড়ি-মাঝি সব ঠিক আছে কি-না। ঠিক থাকে সবই। একটা লোক শুধু উধাও হয়ে যায় মাঝে মাঝে। সে কেদার। হঠাৎ কোনো কোনো দিন সন্ধ্যের পর তার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। কবে যে সে এমনি যাবে—শুধু মাঝি বৈরাগী দাস তা আগে থেকে বুঝতে পারে। কেদার সেদিন গান ধরে দেবে হঠাৎ—জনহীন প্রান্তরে শব্দের ক্ষ্যাপা তরঙ্গ উঠে

নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দেবে। উসখুস করবে ডাঙায় আর নৌকোয়। মুখ-চোখে চাপা অস্বস্তি। তারপর কাবুকে কিছু না বলে বোঁ করে বেরিয়ে পড়বে হাজারো ভাঁজধরা একটা হাফশার্ট গায়ে দিয়ে। মাঝি খুক্ খুক্ করে কেশে বিড় বিড় করে বলবে, 'হেই—শালা মরতে গেল।'

কিন্তু ভোরেই আবার ফিরে আসবে কেদার—চোখমুখ বসা, গায়ে ভুর ভুর করবে তাড়ির গন্ধ। মাঝি বিড় বিড় করে তাকে সম্ভাষণ জানাবে আবার—'শালা মরে এলো।' কিন্তু কেদার যেন বেঁচে ওঠে তারপর। হঠাৎ এক-একটা হাসি চাবুক মারে যেন জনহীন প্রান্তরে, মাঝির গালবসা তোবড়া আশা আশ্বাসহীন মড়ার মতো মুখটায়। কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিন। আবার জনহীন প্রান্তরের শব্দহীন শূন্যতা ঘন হয়ে আসে কাশবনের ছায়ায়। দিনে দিনে কেদার ঝিমিয়ে পড়ে।

এমনি একটা ঝিমনির ঠাণ্ডা পাথর যেন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সেদিন কেদার হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়াল নৌকোর ওপরে। একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'দুত্তোর শালার—ভালো লাগে না।'

মাঝি নীরবে জাল বুনছিল—আড়চোখে তার দিকে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'মরেছে।'

ভবানী হি-হি করে হেসে উঠল।

নৌকোর পেছন দিকে দাঁড়ি-মাঝিদের বারোয়ারী একটা ছোটমতো কাঠের বাক্স। বাক্স খুলে কেদার তার তালগোল পাকানো হাফশার্টটা টেনে বার করল।

মাঝি বৈরাগী দাস হুঁশিয়ারী দিয়ে বলে উঠল, 'সন্‌ঝের পরে মাল বোঝাই হবে নৌকায়—আজ রাত্রেই চালান যাবে। কর্তা বলে পাঠিয়েছে।'

'নূতন কথা শোনাচ্ছ মোকে!' মাঝির কথা উড়িয়ে দিয়ে কেদার হেসে উঠল। 'সন্‌ঝের পরে কবে আবার মাল পড়ে নৌকায় খুড়ো?'

মাঝি বললে, 'কর্তা বলে পাঠিয়েছে—আমিও জানিয়ে দিলম। বাস।'

ভবানী মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তার দিকে চেয়ে কেদার শুধাল, 'সত্যি বল স্যাঙাৎ—রাতেই আজ চালান যাবে?'

'যাবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি ভাবল কেদার। তারপর টেনে জামাটা গায়ে দিল। বলল, 'বেশ। এসে পড়বো ঠিক সময়ে। ভালো লাগে না শালার। গা গতর ভারী হয়ে গেছে।'

বলতে বলতে নৌকো থেকে লাফ দিয়ে কেদার ক্যানেল পাড়ে গিয়ে উঠল।

ভবানী হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, 'স্যাঙাৎ যে চললো গো মাঝি।'

'শালা মরতে চললো।'—

মাঝি আর সেদিকে তাকায় না। তবু জাল বুনতে বুনতে সব যেন গোলমাল হয়ে যায়, বুড়োটে শুকনো হাত দুটো কাঁপে ঠক্ ঠক্ করে—তোব্ড়া মুখটা আরও তোবড়া দেখায়। কিছুক্ষণ বাদে চোখ তুলে দেখে—কেদারকে আর দেখা যাচ্ছে না। ওমনি লাফ দিয়ে ডাঙায় গিয়ে ওঠে। অদ্ভুত এক কৌতূহলে কাশবনের আড়াল থেকে ঝুঁকে ঝুকে উঁকি মারে। কেদার যখন একেবারে চোখের আড়াল হয়ে যায় তখন ফিরে আসে নৌকোয়—অস্থিরভাবে পায়চারি করে নৌকো থেকে ডাঙায়। ডাঙা থেকে নৌকো। মনে হয়—সেও হঠাৎ কেদারের মতো কোনদিন ক্ষেপে চলে যাবে এই ভাসন্ত ঘরটা ছেড়ে। কিন্তু ভবানী জানে, মাঝি যাবে না। তাকে কোনদিন কোথাও যেতে দেখেনি। শুধু ছটফট করবে সে এমনি—কেদার যেদিন যাবে। সারা রাত ঘুমোবে না লোকটা। প্রথমটায় অদ্ভুত লাগত—এখন সবটা গা-সওয়া হয়ে গেছে ভবানীর।

ভবানী একমনে জাল বুনছিল। একবার চোখ তুলে দেখল, মাঝি মুখে চোখে মাথায় জল দিয়ে নৌকোর পেছনে গিয়ে গুম হয়ে বসে আছে। ভবানী বললে, 'স্যাঙাৎ কিন্তু ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ঘরবাড়ি যায় না। দেখছি তো ক-মাস—কাজে ফাঁকি নাই। তবে ওই যা এক-আধ দিন।'—বলে সে মুচকি হাসল।

'ঘরে যাবে! ঘর শালার যমালয়ে।' ক্রুদ্ধ আক্রোশে কথা বলে মাঝি। বললে, 'ই শালা এই লাইনের দোষ—ঘর থাকতে নাই। তুই নূতন ঢুকেছিস—বুঝবি কিছুদিন পরে। তোকে ঢুকিয়েছে এ কাজে ওই শালা ক্যাদার, তোর দফাও রফা।'

কথাটা সত্যি। কেদারই তাকে ঢুকিয়েছে এই কাজে। ভবানী তাই চুপ করে রইল। কেদার লোকটার ঘর এ অঞ্চলে নয়—উত্তর অঞ্চলে। এখান থেকে ক্রোশ দশেক দূরে। তবু তার সঙ্গে জানাশোনা বহুদিনের। কেদারের তখন নিজের নৌকো ছিল—ছোট হাটুরে নৌকো; আর ভবানীর ছিল চাষ-বাস, সেই সঙ্গে ছোটখাট একটা তামাকের দোকান। গঞ্জের হাটে যেত তামাক পাতা আর চিটেগুড় আনতে, কখনো তে-খালির ধানকলে গিয়ে

নিজের জমির বাড়তি ধানটুকু বেচে আসতো চড়া দামে। তখন কেদারের নৌকোতেই যাওয়া-আসা করত ভবানী। তখন থেকেই তাদের স্যাঙাৎ পাতানো। হঠাৎ একদিন দেখাশোনার পথ বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ লেগে গেল—জাপান হানা দিল বাঙলার সীমান্তে। সমুদ্রের পাশ-ঘেঁষা জেলা—জেলে ডিঙি থেকে সুরু করে হাজার দু-হাজার মনি কিস্তি যা ছিল—জরুরী সামরিক কারণে সব কেড়ে নিল গবর্নমেণ্ট অথবা ভেঙে চুবিয়ে দিলে। পরে পরেই আছড়ে পড়ল সমুদ্রের লোনা বান, দুর্ভিক্ষ। প্রায় বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন দেখা দু-জনে—এই হাটে।

কেদারই ছুটে এসে চেপে ধরেছিল ভবানীর হাত, 'স্যাঙাৎ!'

'তুমি এখানে!' ভবানী জিজ্ঞেস করেছিল, 'নৌকা এনেছ বুঝি।'

'নৌকা!' কেদার ম্লান হেসে বলেছিল, 'মোর নৌকা গেছে সেই যুদ্ধের সময়ে সাঙাৎ। হেথা হোথা ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি সদাশিব হাজারার নৌকায়। যাক্'—পুরানো দুঃখের কথা সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কেদার বলে উঠেছিল, 'আবার নূতন করে নিজের নৌকা বাঁধবো স্যাঙাৎ, হাতে যতদিন জোর আছে, এ আমি বলে দিলম।' হেসে বলেছিল, 'আর সেই নৌকায় চড়ে তুমি আবার যাবে ধান বেচতে, তামাক পাতা আর চিটা আনতে।'

ভবানী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'মোরও যে আর দোকান নাই স্যাঙাৎ—ধান বেচতে যাওয়াও শেষ হয়ে গেছে জন্মের মতো।'

'সে কি গো স্যাঙাৎ!'

'বন্যা গেল, দুর্ভিক্ষ গেল। জানই তো সব।'—

পাঁচ বছরে একটা ওলট পালট করা ঝড় বয়ে গেছে। সেই সব কথাই বলেছিল কেদারকে ভবানী। শেষে বলেছিল, 'সব গেছে ওই সদাশিবের ঘরে। এখন মজুর খাটি—খাই।'

এখন সেই সদাশিব নতুন পাঁচশ' মণি কিস্তি ভাসিয়ে দিয়েছে জলে—দুর্ভিক্ষের পরে এ অঞ্চলে প্রথম। জোর চলেছে চালানি কারবার। এ তল্লাটের একটিমাত্র নৌকো।

ভবানী ম্লান হেসে বলেছিল, 'স্যাঙাতের তবু দেখা পাওয়া গেল সদাশিবের দয়ায়। ঘুরে ঘুরে দেখা হয়ে গেল।'

'তোমার গেছে জমি, কারবার—মোর গেছে নৌকা,' কেদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল। 'যাক—আবার হবে। আমি বলি, তুমি দাঁড়ির কাজে মোর সঙ্গে এসে লেগে যাও স্যাঙাৎ। তারপর দু-জনে

খেটেখুটে টাকা জমিয়ে এক সঙ্গে নৌকা বাঁধবো। তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে আরও জোর পাই স্যাঙাৎ। আসবে? বল?'

কথাটা সেদিন মনে ধরেছিল ভবানীর: নিজের নৌকো—নিজের ব্যবসা। আবার নতুন জীবনের মোহ।...

কিন্তু বৈরাগী মাঝির কাছে সেই সব পুরাণো আশা-আশ্বাসের কথা বলতেই সে হেসে উঠল। বললে, 'আমিও আজ দশ বচ্ছর নৌকা বাঁধছি হে। তুইও বাঁধবি ক্যাদারের সঙ্গে। ক্যাদার শালা আর ক-দিন বাঁচবে? যারা গুণ টানে তারা বেশী দিন বাঁচে না।'

ভবানী আর কোনো কথা বলে না। মাঝি লোকটা অত্যন্ত নির্মম ভাবে তার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়; লোকটার সামনে বসে থাকতে ভালো লাগে না আর। নৌকো থেকে ক্যানেল পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় চুপ করে। তারপর গুটি গুটি সে এগোয় গ্রামের দিকে—ঘরের দিকে। মনে মনে ঘোরে মাঝির কথা: এ লাইনে ঘর থাকতেও নাই। কিন্তু কেন? প্রশ্নের জবাব সে খুঁজে পায় না। কেদারের মুখে কোনোদিন সে ঘরের কথা শোনেনি, মাঝিরও না। হয়তো ওদের কেউ নেই। কিন্তু তার মা আছে, ভাই-বোন আছে। গঞ্জের হাটে চালান নিয়ে যাওয়ার আগে একবার দেখা করে আসতে চলল সে।

সন্ধ্যের পরে সুরু হলো মাল বোঝাই। গ্রাম থেকে একটা খাল এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে এসে ক্যানেলে পড়েছে। বড় বড় বস্তা বোঝাই তিন তিনখানা ডিঙি বেরিয়ে এল গ্রামের ভেতর থেকে—এসে ভিড়ল বড় চালানি নৌকোর গায়ে। সদাশিব স্বয়ং ডিঙিতে বসে ছিল, নৌকোয় উঠে এল।

বৈরাগী বলে উঠল, 'মাল তো উঠবে কর্তা—এদিকে দু-জনের কারুর দেখা নাই।'

'গেল কোথায়?'

'একজন পাখীর মত ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ঘরে যাবে, আর একজন মরতে। এ সব লোক দিয়ে কাজ চলবেনি।' —

অভিযোগে কান নেই সদাশিবের। ডিঙি থেকে নৌকোয় বস্তা তোলার ব্যাপারেই তখন নজরটা বেশি।

বৈরাগী বিড় বিড় করে বলল, 'শালা ই লাইনের দোষ। মেয়েমানুষের জন্যে ক্ষেপে উঠল ত—বাস্।'

দেখতে দেখতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে নৌকা বোঝাই হয়ে গেল বস্তায়।

বস্তার ওপরে কুমড়োর চালান। এসব শেষ হওয়ার পর সদাশিব যখন মুখ তুলল তখন ভবানী এসে গেছে। তাকে সামনে পেয়েই খেঁকরে উঠতে যাচ্ছিল সদাশিব। ভবানী বলে উঠল, 'ছোট গিন্নী একটা ভাল সুবাস তেল আনতে বলে দিল মনে করে।'

হঠাৎ জল হয়ে গেল সদাশিব। ছোট গিন্নী সদাশিবের তৃতীয় পক্ষ। হাসি-হাসি গলায় বলল, 'তোকে বলল বুঝি? আসবার সময় আমাকে ত কিছু বলল না! তা মনে করিয়ে দিবি একবার তে-খালির গঞ্জে। আমি পাঁচ ঝামেলার মানুষ। টাকা দিয়ে দেব তোর হাতে।'

ভবানী মাথা চুলকে বলল, 'টাকা মোকে দিয়েছে—দুটো টাকা।'

'তোকে দিয়েছে!' সদাশিব একটু যেন দমে যায়।

নৌকার পেছন থেকে বৈরাগী হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠল, 'এঃই—মরেছে শালা।'

সদাশিব বলল, 'ক্যাদারকে হাঁক দে একটা—এখুনি ছাড়তে হবে নৌকা। রাতের জোয়ারে আজ লক গেট পেরিয়ে নদীতে বেরিয়ে যেতেই হবে।'

দূরের পাল্লা। বারো মাইল পথ। কেদার যদি আজ রাতে না ফেরে তা হলে একাই টেনে যেতে হবে নৌকা। এ সব ব্যাপারে সদাশিব কড়া লোক। পুব আকাশের দিকে চেয়ে দেখল ভবানী—সন্ধ্যে তারাটা অনেক দূর উঠে এসেছে। কেদারের তখনও দেখা নেই। ক্যানেল পাড়ে উঠে এলো ভবানী। মুখের কাছে দু-হাত চোঙের মত করে গলা ছেড়ে হাঁক পাড়ল:

স্যা ··· ঙাৎ ··· হে ··· এই ··· ই

নৌকার দাঁড়ি-মাঝিদের বিশেষ এক ধরনের হাঁক। অন্ধকারে নদীতে নৌকা থেকে নৌকায় এমনি ক'রে হাঁক পেড়ে সাড়া নেয়। সে হাঁক বহুদূর পর্যন্ত চলে যায় কেঁপে কেঁপে।

ভবানী হাঁক পেড়ে কান খাড়া করে রইল—পাল্টা কোনো সাড়া আসে কি-না দূর থেকে। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল খুব কাছে। কেদার আসছে। কেদার হেসে বলল, 'ভয় নাই স্যাঙাৎ—এসে গেছি।'

'এখুনি ছাড়তে হবে লৌকা।'

'কুচপরোয়া নাই। চলো।'

ভবানী হাসল কেদারের দিকে চেয়ে। বিকেলের মরা ঝিমধরা কেদার অন্ধকারে যেন বেঁচে উঠেছে।

নৌকা ছেড়ে দিল।

গ্রামের রাত্রি। দূরের গ্রামগুলিতে নিষ্প্রদীপ। অন্ধকার নির্জন আর গভীর। ক্যানেলে আর কোন নৌকো নেই। যতদূর চোখ যায় জীবনের কোনো চিহ্নই নেই। জনমানবহীন একটা আদিম ভূখণ্ড যেন সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে পড়ে আছে আকাশের তলায়।

জনমানবহীন সেই অন্ধকারে ক্যানেল পাড়ের ওপরে পাঁচ শ' মণি ভরা কিস্তির কাছি কাঁধে করে ভূতের মতো দুটি মানুষ কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। আগে আগে কেদার। ওদিকে অন্ধকারে তীব্র দৃষ্টি মেলে নৌকোর মাথার কাছে ঘুপটি মেরে বসে আছে সদাশিব। কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু হালটা বিশ্রীভাবে কঁ্যাচকোঁচ শব্দে আর্তনাদ করে উঠছে।

ভবানীর চুপচাপ ভাল লাগছে না। বলল, 'লৌকায় এবার কি মাল যাচ্ছে বল দিকিন স্যাঙাৎ?'

'কুমড়োই তো দেখলাম।' কেদার বলল, 'কিন্তু শালার কি ভারি গো।'

ভবানী হেসে বলল, 'কুমড়ো লয়—ধান। কুমড়োর তলায় ধানের বস্তা—মেলা ধান হবে।'

'বুঝেছি। চোরাবাজারের ধান। তাই সন্ধ্যের পরে মাল বোঝাই? তাই রাতারাতি ক্যানেল ছেড়ে নদীতে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলল কত্তা?'

'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বল দিবিন?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল ভবানী।

'কি জানি।'

'তে-খালি গো।' সরস কৌতুকে ভবানী বলল, 'ধানকল।'

ভবানী মৌজ হয়ে আছে তখন থেকে—যখনি সে শুনেছে নৌকো যাবে এবার তে-খালির গঞ্জে। কতদিন পরে যাবে আবার সেখানে।··· কেদার কিন্তু কোন কৌতুক বোধ করে না। বেপরোয়া কেদারের কোন কিছু মনে নেই।

ভবানী একটি গানের লাইন আওড়াল: 'কালো না ভোমরা, রাঙা না ফুল হে!'

মনে পড়েছে এবার কেদারের। সে বাকী লাইনটি আওড়াল: 'কুঁচ বরণ কন্যা মেঘবরণ চুল হে।' বলল, 'ভুলেই গেছলাম স্যাঙাৎ। যে ঝড়-ঝাপটা গেল! কতদিন যে যাইনি উদিকে।'

সে পাঁচ-সাত বছর আগের কথা। কেদারের তখন নৌকো ছিল, ভবানীর ছিল তামাকের দোকান—মাল কিনতে যেত কেদারের নৌকোয়

চড়ে। ধানকলের পেছনে নৌকো এসে পড়লেই কেদার দাঁড় টানতে টানতে গেয়ে উঠত ঃ

কালো না ভোমরা রাঙা না ফুল হে।...

ভবানী হাসি মুখে চেয়ে চেয়ে দেখত, একটি বছর ষোল বয়সের মেয়ে খেয়াঘাটের পাশ-ঘেঁষা একটা কুঁড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সকৌতুকে। বাপ ছিল তার খেয়াঘাটের মাঝি। মেয়েটার নাম ছিল ভোমরা।

খেয়াঘাটের পাশে ছোট একটা কুঁড়েতে ছিল বাপ-বেটির সংসার। বাপের সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ জমিয়েছিল বেপরোয়া কেদার একদিন—ভবানীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। তারপর থেকে ভবানী মাল করতে যেত কাছের গঞ্জ পেছনে ফেলে দূরের সেই তে-খালির গঞ্জে। সন্ধ্যের পর গিয়ে গল্পগুজব করত ভোমরার বাপের সঙ্গে, তামাক খেত আর হঠাৎ জলতেষ্টা পেয়ে যেত। কেদার হাসত মুখ টিপে। বলত, 'দেখতে চুপচাপ কিন্তু লোকটি তুমিও কম লয় সাঙাৎ। জল খাওয়ার নামে সামনা সামনি পেয়ে গেলে একেবারে। ফিরতিবার আমিও শালা জল খাব।'

যেন নেশা লেগে গিয়েছিল—দু-জনেরই, দু-জনেরই সমান উৎসাহ। গঞ্জ থেকে ফেরার পথে মুষড়ে থাকত দু-জনেই, কথা কইত ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা। তবু সব কথার মাঝখানে ভোমরার কথাই এসে পড়ত বারে বারে। ভেবে যেন কুলকিনারা পেত না—বিয়ের কথাটা কে কিভাবে তুলবে।

শেষ পর্যন্ত ভোমরার বাপই একদিন তুলেছিল কথা। এক গাল তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, 'লা-লৌকার লোককে আমার বিশ্বাস নাই। কোথায় সে ঘুরবে ঘাটে অঘাটে—মেয়া মোর একলা পড়ে থাকবে। এমন একটি ছেলে যদি পাই কিছু জমিন জায়গা আছে।' বলে ভবানীকেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'আছে তোমার সন্ধানে?'

কেদার চটে বলেছিল, 'কেন--লা-লৌকার লোক কি মানুষ লয়—এঁ্যা?'

বুড়ো চুপ করে গিয়েছিল।

ভবানীর মুখের দিকে চেয়ে কেদার তারপর রাগ সামলে বলেছিল, 'তা আমার স্যাঙাৎ তো আছে—জমি জায়গা ব্যবসা, সব আছে। দাও না তার সঙ্গে সাদি।'

সেদিন এর বেশী আর কথা এগোয়নি। দু-জনেই চুপচাপ নৌকোয় এসে উঠেছিল। অনেকক্ষণ কারুর মুখে আর কথা নেই। হঠাৎ দুজনের মধ্যে যেন দুস্তর ব্যবধান একটা মাথা ঠেলে উঠল। শেষ পর্যন্ত ভবানী বলেছিল, 'ও মেয়া আমি বিয়ে করবনি হে স্যাঙাৎ।'

'কেন ?'

'তুমি কষ্ট পাবে।'

কেদার ম্লান হেসে বলেছিল, 'আমি কষ্ট পাব! না স্যাঙাৎ—ও সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বিয়ে কর, ঘর সংসার কর। সত্যি তো, আমি লা-লোকার লোক—ঘাটে ঘাটে দিন কাটে। হাঁ বটে—মোর স্বভাব চরিত্তির ভালো লয়। তোমার কাছে ভোমরা সুখে থাকবে।'

তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে ওলোট পালটের মধ্যে। পাঁচ বছর পরে আবার চলেছে তারা সেই তে-খালির গঞ্জে। ভবানীর মনে মনে পুরাতন সেই সোনার মতো দিনগুলি ঘনঘোর হয়ে আসে। গ্রামের শান্ত স্থির জীবনের মাঝখানে সেদিনের আশা ও কামনা আজ তার মনের মধ্যে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে: ভাবীকাল তখন ছিল আশা-আশ্বাসে ভরা আর আজ শুকিয়ে যাওয়া চারা ধানগাছের মতো নেতিয়ে পড়া ভবানী। পায়ের গতি হয়ে আসে শ্লথ। পেছনে গুণের কাছি ঝুলে পড়ে আলগা হয়ে।

শুধু বেপরোয়া কেদার হেঁকে বলল, 'জোর লাগাও স্যাঙাৎ—দুরন্ত পথ।'

ভবানী সচকিত হয়—লজ্জা পায় মনে মনে। কাছিতে একটা জোর টান দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। বলল, 'তুমি যদি সেদিন ভোমরাকে বিয়ে করতে স্যাঙাৎ—তবে বেশ হত।' ভোমরার কথাই তুলতে চায় ভবানী—তার কথাই আজ কইতে চায় প্রাণ ভরে। জমি গেছে, ব্যবসা গেছে—খরচের জন্যে লোকটার বাকী আছে শুধু যেন ওইটুকু সম্বল।

কেদার হেসে উঠে বলল, 'তারপর শালা মাঝির মতো ঘরে ওদিকে ভাঁ।'

'মাঝির কি হল ?'

'কি আর হবে—বৌ পালিয়েছে কার সঙ্গে। ও শালা তো ঘোরে ঘাটে ঘাটে। শালার ই লাইনে ঘর থাকতেও নাই। বুঝলে স্যাঙাৎ—ভোমরার বাপ তখন ঠিক বলেছিল।'

মাঝির মুখেও আজ এই কথা শুনেছে ভবানী। গুণ টানতে টানতে তবু সে ঘর বাঁধার কথাই ভাবে, ভোমরার কথাই ভাবে। একটা আশ্চর্য নাম আজ যেন তার জীবনের আশা-আশ্বাসগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছে।

কেদার বলল, 'ভোমরার যদি বিয়ে সাদি না হয়ে থাকে তবে তুমিই এবার ঠিক করে ফেল স্যাঙাৎ। ঘর-টান লোক তুমি, ঘর-সংসার পাত। আমি জলে ভাসা লোক।'

বিষণ্ণ গলায় ভবানী বলল, 'আমিও তো আজ জলে ভাসা লোক

সাঙাৎ। যে সদাশিবের কাছে সর্বস্ব গেছে—তারই লৌকার দাঁড়ি, বাঁধা মাইনার চাকর।'

'আমি তোমার স্যাঙাৎ হে—দুঃখের দিনের সাথী। ফাটা কপাল দু'জনেরই।' কেদার বলল, 'মোর গেছে লৌকা আর তোমারই জমির ধান হয়তো আছে এই লৌকায়। কাঁধে করে টেনে টেনে লিয়ে চলেছি আজ দু'জনে।'

ভবানী শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বড় ক্লান্ত লাগে—বড় দুর্বল মনে হয় ভবানীর। তোমরা এবার সকৌতুকে দেখবে—সদাশিবের নৌকোয় গুণ টেনে টেনে এল সেই ভবানী!

ভবানী বলল, 'লৌকা একটু থামিয়ে তামাক খেলে হত সাঙাৎ।'

'বেশ—খেয়ে লাও।' কেদার দাঁড়াল।

ওদিকে সদাশিব খেঁকরে উঠেছে, 'ফ্যাসাদে ফেলবে শালারা। যেইখানে বিপদ—সেইখানে নৌকা বেঁধে তামাক খেতে বসল।'

এখান থেকে মাত্র মাইল খানেক তফাতে থানা। সদাশিব চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নৌকোর ওপরে।

কেদার গুণ দড়ি ফের কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, 'চল স্যাঙাৎ। হেথা ধরা পড়ার ভয়। চোরের মায়ের বড় গলা হে।'

'চল।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ভবানী।

একটানা মাইলের পর মাইল গুণ টেনে এল তারা। নিরাপদে লক গেট পেরিয়ে নদীতে পড়ল। এবার পড়ল দাঁড়। ক্যানেলের মুখে নদীতে নৌকোর ভিড়। সে ভিড় এড়িয়ে কিছুটা দাঁড় বেয়ে এসে নির্জন নদীচরে নোঙর করলো তারা। নদীর কিনার থেকে সুরু হয়েছে জালপাই মহাল—দিগন্তবিসারী ধানক্ষেত। জলা-জঙ্গল। থানা পুলিস বহুদূরে। সদাশিব এবার নিশ্চিন্তে ছইয়ের ভেতরে ঘুমোতে গেল।

ভবানী বলল, 'শোবে কোথায় বল দিকিন স্যাঙাৎ। এই কুমড়োর ওপর কি শোয়া যায়?'

'চল ডাঙায় উঠি।'

দু-জনে ডাঙায় উঠে গেল। কাঁধের গামছাটা মাটিতে পেতে ধুপ ধুপ করে সোজা হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো দু-জনে।

কেদার বলল, 'এমন সময় একটু তাড়ি পেতাম যদি। শালার গা-হাত বেথা হয়ে গেছে গ'।'

কিন্তু ভবানীর মনে পুরানো দিনের স্বপ্ন। বলল, 'কাল এমন সময় তে-খালির গঞ্জে।'

ইঙ্গিতটা বুঝে কেদার হেসে বলল, 'এমন সময় ভোমরা কাছে থাকলে কেমন হত বল দিকিন স্যাঙাৎ?'

বড় ভাল লাগত ভবানীর। কিন্তু ঠিক এইখানে না—কোন একটা গ্রামে, কোনো একটা ঘরে। কেদার সে কথা ভাবে না। তার শুধু একটু নেশা—একটা মেয়েমানুষ।

ভবানী বলল, 'তোমার ভোমরা কি আর কোথায় কি। তোমার সব সমান সাঙাৎ। শুধু দু-দণ্ডের আমোদ।'

কেদার চুপ করে রইলো। ভবানীর মনে আজ হাজার ভাবনার হট্টগোল।

খানিক বাদে ভবানী জিজ্ঞেস করল, 'যারা গুণ টানে তারা কি বেশী দিন বাঁচে না স্যাঙাৎ?'

কেদার তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে শুধু বলল, 'হুঁ'।

'আচ্ছা—মাঝির বৌ পালিয়েছে কতদিন?'

কেদার এবারও শুধু হুঁ দিল। বোঝা গেল—কেদার কিছুই শুনছে না।

অসংখ্য কথা মনে আসে ভবানীর—অসংখ্য এলোমেলো কথা। শেষে সে বলল, 'মোর কি ইচ্ছে জানো স্যাঙাৎ? এবার তে-খালি আসতে আসতে ভাবছিলাম—।'

কেদার কোন সাড়া দিল না।

বোধ হয় ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে। ভবানীর ভাবনার কথা কেউ শুনলো না। নিস্তব্ধ অন্ধকার শব্দতরঙ্গে শুধু একটু কেঁপে উঠে আবার জমাট হয়ে গেল। নিঃশব্দে জমাট হয়ে গেল।

শুকতারা উঠেছে নদীর ওপারে—আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাত শেষ হয়ে যাবে। ভবানী জ্বালা করা চোখদুটো জোর করে বন্ধ করল। আশা আর স্বপ্নগুলো তবু যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বন্ধ চোখের ওপরে, মনের ওপরে ক্ষুধার্ত এক পাল নেকড়ের মত।

পলি ভরাট মজা নদী। ভাটার সময়ে অতবড় চওড়া নদীটা চড়াপড়া সারা বুকটা চিতিয়ে পড়ে থাকে—যেন ডাঙা। সারাদিন সেই চড়ায় নোঙর করে রইল সদাশিবের নৌকো। বিকেলের দিকে জোয়ার এলো। দু-খানি দাঁড় পড়ল আবার।

কেদার দাঁড়ে প্রথম টান দিয়েই ভবানীর মুখের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলে উঠল ঃ

'এবার চলো পান্‌সি তে-খালি। কালো না ভোমরা রাঙা না ফুল হে।'

ভবানী হাসল। এ সেই পুরানো দিন···পাঁচ বছর আগের মত যেন। তবু কেমন যেন তাল কাটা মনে হয়। সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

সন্ধ্যের মুখোমুখি নৌকো ভিড়ল এসে তে-খালির গঞ্জে, আরও কয়েকটা বড় বড় চালানি নৌকোর পাশে। দূর থেকে অদ্ভুত লাগে গঞ্জের বাজারটাকে। সারা বাজারটা আলোয় আলো ঃ যেন দেয়ালী উৎসব। নৌকোগুলো যেখানে ধানকলের পেছনটায় নোঙর ফেলেছে সার বেঁধে, সেখানে অন্ধকার। সেখান থেকে শুরু হয়েছে ঘন জমাট অন্ধকারের সমুদ্র ঃ নদী জুড়ে, জালপাই মহাল জুড়ে, অনেক গ্রাম-গ্রামান্তর জুড়ে। সেই নিরুদ্দেশ অন্ধকারের মাঝখানে গঞ্জের বাজারটাকে মনে হয় একটা আলোর পিণ্ড। অন্ধকার আকাশের অনেকখানি পর্যন্ত আলো ছিটকে গেছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে—চারটে চোঙ আকাশে উঁচু হয়ে আছে। হাওয়ায় বিশ্রী ধানপচা গন্ধ।

ভবানী চেয়ে চেয়ে দেখছিল ধানকলের চোঙগুলো। বলল, 'দুটো চোঙ ছিল স্যাঙাৎ—চারটে হয়েছে।'

'হ্যাঁ স্যাঙাৎ। আর তার মধ্যে সদাশিব হাজরার নৌকোয় দাঁড়ি হয়ে এসেছি এবার মোরা দুই স্যাঙাৎ'—কেদার বলে উঠল, 'সেটাও দেখ।' কথায় আত্মঘাতী বিদ্রূপ।

পাঁচ বছরে দুটো চোঙ বেড়েছে। অনেক জিনিস উল্টেপাল্টে গেছে। ভোমরা কেমন আছে ? মুখ ফুটে বলে না—মনে মনে ভাবে ভবানী।

সদাশিব উঠে গেছে ধানকলের গদিতে। রাতারাতি মাল খালাস ক'রে নৌকো নিয়ে ফিরে যাবে আবার রাতের জোয়ারে। ভবানীর মন উসখুস করছে খেয়াঘাটের দিকে যাওয়ার জন্যে।

ভবানী ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'মোরাও যাই চলো স্যাঙাৎ—একবার খোঁজ করে আসি।'

ধানকলের পেছন দিয়ে নদীর ধারে ধারে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে খেয়াঘাটের দিকে—যেখানে এসে মিলেছে মহকুমা শহরের পাকা সড়ক। তারই একটু তফাতে বাবলা বনে ঘেরা একটা ডোবার ধারে ছিল পাঁচ বছর আগের একটা কুঁড়ে। আজ তার চিহ্নও নেই। আরও কিছুটা পশ্চিমে হয়েছে নতুন একটা কুঁড়ে—এসেছে নতুন মাঝি। নীলাম হেঁকে ঘাট জমা নিয়েছে নতুন নীলামদার—নতুন ধানকলের গয়ারাম মারোয়াড়ী।

কেদার অবলীলায় বলল, 'বোধ হয় মরে গেছে।'

'দু-জনেই !'

'হতে পারে। কত কি তো হয়ে গেল। ভেবে দেখ—কত লোক তো মরে গেল আকালে।'

ভবানী চুপ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল ভূতের মত।

কেদার তার হাতে মৃদু একটা টান দিয়ে বলল, 'চল—তাড়ি খেয়ে লি একটু। মনের বেথা, গায়ের বেথা সব চলে যাবে হে স্যাঙাৎ—চলো। ভাকু তাড়িয়ালের কারবার শালা ঠিক আছে বোধ হয়।'

ঠিক আছে—হয়তো সে-সব ঠিক আছে। শুধু ভবানীর মনের মধ্যে ঠিক এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শূন্যতা। অন্যমনে সে কেদারের পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

ধানকল ছাড়িয়ে কিছুটা গিয়েই একসার কুঁড়ে। কয়েকটি কুঁড়ের গায়ে আলকাতরা বা খড়ি দিয়ে লেখা—'প্রবাসী থাকিবার স্থান।' উটকো লোক, গ্রামের পাইকারী ব্যবসায়ী-বাজারী গঞ্জে হাট-বাজার করতে এসে রাত্রিবাস করে এইখানে। এরই পাশ ঘেঁষে লম্বা চালা। ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা। সামনে বসে সন্ধ্যের পরে জটলা করে বিভিন্ন বয়সের গুটি কয়েক মেয়ে-মানুষ—হাসে, চল্‌তি লোকের দিকে চেয়ে কটাক্ষ হানে। ধান-কলে তারা কাজ করে দিনের বেলা—রাতে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে কপালে কাঁচ পোকার টিপ পরে কুঁড়ের সামনে গল্পগুজব করে। প্রবাসীদের কুঁড়ে থেকে ছিটকে আসে এক-আধ জন এদের কুঁড়েতে, কখনো খেয়ালী মহাজন —গ্রামের ভদ্রলোকও, অধিকাংশই আসে মাঝি-মাল্লার দল।

সেই পথ দিয়ে ঘুরে চলেছে কেদার।

ভবানী বলল, 'তোমার মতলব ভালো লয় হে স্যাঙাৎ। যাবে কোথায় বল দিকিন? ইদিক দিয়ে গেলে তাড়ির দোকান যেতে ঘুর হবে অনেকটা।'

কেদার হেসে বলল, 'চল না সাঙাৎ ঘুরেই যাই একটু। দেখে যাই। ভয় নাই—তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

দূরে কতগুলি মেয়ে জটলা করছে এক জায়গায়। দূর থেকে বাজারের আলোর মলিন রেশ একটু এসে পড়েছে সেখানে। কাছাকাছি এসে দু-জনেই থমকে দাঁড়াল।

কেদার বলল, 'হেই দেখ স্যাঙাৎ—তোমার ভোমরা কোথায়।'

ভবানীর মনের মধ্যে একটা ওলটপালট সুরু হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কাল রাতে একটা নরম মাটির ভিতের ওপরে খাড়া করা

তার সাধের ঘর—তার ব্যবসা, তার জমি আর জীবন সব ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় করে। শুধু কেদার বেপরোয়া ভাবে এগিয়ে গেল।

'কি গো, চিনতে পার?'

'অ মাগো—কত দিন পরে দেখা গো!'

বহুদিন পরে দেখা। ভবানী দাঁড়িয়ে রইল দূরে। দূর থেকে আর কোন কথা শোনা যায় না—শুধু দেখা যায়, কেদারের অতি পরিচিত সেই ক্ষেপে ওঠা চোখ মুখ, ভোমরার ঘাড় বেঁকিয়ে হাসি। সবটা অসহ্য লাগছে ভবানীর। আর যেন সে দাঁড়াতে পারছে না।

কেদার ফিরে এসে বলল, 'টাকা আছে স্যাঙাৎ—একটা টাকা?'

ভবানী চুপ।

কেদার আবার বলল, 'থাকে তো চল। মোর কাছে শুধু একটি টাকা আছে। না হলে তোমাকে ধার দিতাম।'

ভবানীর কাছে টাকা আছে—সদাশিবের তৃতীয় পক্ষের দেওয়া সুবাস তেল কেনার সেই দুটো টাকা। কয়েকটি মুহূর্ত। ভবানী নিঃসাড়—মনের মাঝখানে ঘটে যাচ্ছে আবার একটা প্রচণ্ড প্রলয় যেন। পাশাপাশি দুটো মুখ ভেসে উঠছে। একটি ওই আধো আলো-অন্ধকারে আর একটি অনেক দূরে, কোনও এক গ্রামে, কোনও এক ঘরে—একটি প্রশান্ত সুন্দর মুখ, পবিত্র আর শান্ত। সে মুখটা জিতে গেল। একটা অস্বস্তিকর ঘৃণা সাপের মত ফোঁস করে উঠল ভবানীর মনের মধ্যে।

ভবানী বলল, 'নাই—মোর টাকা নাই।'

'তবে তুমি চলে যাও নৌকায়—আমি আসছি খানিক বাদে।'

চলে গেল বেপরোয়া কেদার।

ফিরতি পথে বড় একা একা লাগে ভবানীর। সে যেন হেরে গেল। সবখানে হেরে গেল সে। হেরে গেছে সদাশিব হাজরার কাছে। হেরে গেল বেপরোয়া কেদারের কাছে, পাঁচ বছর পরে ভোমরার কাছেও।

কেদার বলেছিল, ভাকু তাড়িয়ালের কারবার হয়তো ঠিক আছে। হ্যাঁ—ঠিকই আছে। এক কোণে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। ম্লান আলোয় দু-তিনটে জটলা করে গোল হয়ে বসেছে মাঝি-মাল্লারা, আড়তের কুলিরা। পাশে গড়াগড়ি যাচ্ছে কয়েকটা খালি তাড়ির কলসি—হাওয়ায় পচা টক গন্ধ। এখান থেকে বাজারের আলো দেখা যায় না, এখানে এসে পৌঁছয় না বেনেতি বাজারের কলরব। কতকগুলো লোক মৌজ হয়ে আছে এখানে নিজেদের চেঁচামেচিতে—গানে, হল্লায়। দূর থেকে মনে হয়,

কতকগুলো ক্ষ্যাপা জানোয়ার যেন একটা জায়গায় গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গর্জে মরছে।

ভবানী এসে ঢুকলো।

তার ঢোকাটাই কেমন বেয়াড়া লাগে সকলের। সবাই চমকে ওঠে—পিট পিট করে তাকায় তার দিকে। লোকটা যেন এখুনি সকলকে পিটোতে শুরু করবে। তাদের গান থেমে গেল। একটা লোক একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে বসে চোখ বুজে প্রাণপণে দু-হাতে বাক্সটা পিটিয়ে যাচ্ছিল—সেও চোখ মেলে চাইল। নতুন লোক দেখে বলে উঠল ঃ

'বৈঠ্ যাও দোস্ত—বৈঠো, তাড়ি খাও—ফুর্তি করো, হাঁ।'

লোকটা নতুন মারোয়াড়ী ধান-কলের দারোয়ান—কথা বলে হিন্দী আর ভাঙা বাঙলা মিশিয়ে। তারপর আবার সে চোখ বুজে বাক্স পিটোতে সুরু করে।

দল ছাড়া হয়ে মুখ গুঁজড়ে বসে আছে আর একটি লোক—আধবুড়ো মানুষ। মাটিতে দাগ কেটে যাচ্ছে শুধু। নেশায় বুঁদ। মুখ তুলে সে দু-হাত জোড় করে অত্যন্ত বিনীতভাবে মাটিতে মাথা ঠুকে ভবানীকে একটি গড় করল।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর আবার সুরু হয় গান আর হল্লা। তার সঙ্গে ভবানীর গলাও কখন মিশে যায়। প্রাণপণে যেন চেঁচায় সে—গান ধরে দেয়। যত চেঁচানি, যত হল্লা তার মনে জমেছিল এতদিন ধরে—সব যেন সে উজাড় করে দেয়।

কিছুক্ষণ হৈ-হল্লা ক'রে আর ভালো লাগে না ভবানীর। বারে বারে মনে পড়ে যায় কেদার আর ভোমরার মুখ। তাড়ির আড্ডা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। পা টলছে, গা গরম হয়ে গেছে।

নৌকোয় ফিরে এসে ভবানী গুম হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। মাঝি বৈরাগী দাস চিরকেলে অভ্যাস মতো নৌকোয় পায়চারি করছে, আর মুখে চোখে জল দিচ্ছে আঁজলা আঁজলা।

ভবানী দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো হঠাৎ, 'মর শালা।'

বলে সে নৌকো থেকে নেমে পড়ল আবার। ট্যাকটা একবার টিপে দেখল—তখনও আছে এক টাকা বারো আনা, চার আনার তাড়ি খেয়েছে। কেদার বলেছিল—একটাকা আছে? থাকে তো চল।...তারও বেশী আছে তার কাছে। চুলোয় যাক্ সদাশিবের বৌয়ের সুবাস তেল কেনা।

ভাটায় নদীর জল নেমে গেছে অনেক নিচে। এক হাঁটু পলিমাটির কাদা ঘেঁটে এগুলো ভবানী।

তীরের শুকনো মাটিতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সে ঃ কেদার আসছে টলতে টলতে। সে-ও তাড়ি খেয়েছে। থমকে দাঁড়াল এসে সামনা সামনি। ভবানীর ভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে বলল, 'কে গো, স্যাঙাৎ বটে? হে হে— ভোমরার কাছ থেকে এলাম স্যাঙাৎ হে ··· সেই ওর বাপের ছিল বড্ড বড় বড় বুলি হে সাঙাৎ, আজ শুধু এক টাকার ভোমরা। তোমাকেও বললাম —চল, সাধ মিটিয়ে লও।···

হঠাৎ একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ভবানী। প্রাণপণে গলা চেপে ধরল সে কেদারের।

'কি হল—কি হল সাঙাৎ! মাথা গরম করোনি।···ভোমরা তো এখন বাজারের মেয়েছেলে—ভোম্‌রা তো···'

কেদার কথা বলতে পারল না আর—দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

দু-জন ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে গড়িয়ে গেল নদীর কাদার মধ্যে।

পলি মাটির মধ্যে কেদারকে ঠেসে ধরেছে ভবানী। হঠাৎ ছিটকে পড়ল সে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে। বাঁচার তাগিদে কেদার কষিয়েছে একটা প্রচণ্ড লাথি—সোজা তলপেটে।

ভবানী পড়ে রইল তেমনি। মুখ দিয়ে নোন্‌তা কি বেরিয়ে এল যেন এক ভলক। কেদার ফিরেও তাকাল না—টলতে টলতে কোন রকমে এগিয়ে গেল নৌকোর দিকে। গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল নৌকোর মাথার কাছে। সারা গা অবশ হয়ে আসছে। গলাটা এখনও যেন কে চেপে ধরে আছে। আস্তে আস্তে সে গলায় হাত বুলোতে লাগল। দম নিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'মেরে ফেলত—মোকে মেরে ফেলত স্যাঙাৎ!'

নৌকোগুলো অনেকটা দূরে—ভাটার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি নিচে নেমে গেছে জলের মুখে মুখে। অন্ধকারে ঝিম হয়ে আছে। সেখানে কোন সাড়া শব্দ নেই।

লোকজন জোগাড় করে রাতারাতি বস্তা সব উঠে গেছে ধানকলের গুদামে। শুধু কুমড়োগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে নৌকোর ওপরে। শেষরাতের জোয়ার শেষ হয়ে ধরল ভাটার টান। তবু ভবানীর দেখা নেই।

নৌকো থেকে নেমে এল কেদার। নদীর জল কমছে ধীরে ধীরে। এক হাঁটু কাদা ভেঙে ভেঙে গিয়ে দাঁড়াল সে সেই জায়গাটায়—যেখানে দু-জন ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে কাল রাতে—উল্টে পড়েছে ভবানী। কিন্তু সে জায়গাটা যেন চেনাই যায় না আজ ভোরে, যেন কোনো কিছুই হয়নি তাদের বহুদিনের দুই স্যাঙাতের ভেতরে। রাতের জোয়ারে সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে—

নতুন পলি পড়ে সবটা দেখাচ্ছে মসৃণ পালিসের মতো। এতটুকু আঁচড় নেই কোথাও। চিহ্ন নেই ভবানীর।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে দুই হাত চোঙের মত করে হাঁক দিল সে ঃ

'স্যাঙাৎ ··· হে ··· ই।'

হাঁক দিয়ে কান খাড়া করে রইল অনেকক্ষণ। কোনো সাড়া এলো না। কানে এসে লাগছে শুধু ভাটার টানের অবিশ্রান্ত কলকলানি। অবাক হয় কেদার ঃ লোকটা কি তবে ভেসে গেল!

নৌকোয় ফিরে এল মুখ শুকনো করে। বলল, 'পেলম নি খুঁজে। গেল কোথায় লোকটা!'

মাঝি নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিড় বিড় করে শুধু বলল, 'শালা মরেছে।'

'মরুক।' সদাশিব তাড়া দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দে নৌকা।'

'ছাড়়।' বলে নৌকো থেকে নেমে গেল কেদার।

'তা তুই যাস কোথায়?' সদাশিব খেঁকরে উঠল।

কেদার বলল, 'মোর স্যাঙাৎকে খুঁজতে।'—

সেই তার হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া বেপরোয়া মূর্তি—সবল পা ফেলে ফেলে উঠে গেল পাড়ের ওপরে। একবার ফিরেও তাকাল না। শুধু দূর থেকে আবার একবার ভরাট গলার ডাক শোনা গেল ঃ

'সাঙাৎ ··· হে ··· ই ···!' ···

গ্রামনগর ॥ ১৯৫০

খুনী

দুই অফিসের দরবার। সার্কেল অফিস আর থানা পাশাপাশি। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে চৌকিদারেরা আসে হপ্তার হাজিরা দিতে। গাঁয়ের মানুষ—চাষা-ভুষোর গোত্র। চাষ-আবাদই জীবিকার ভিৎ। তবু গায়ে বেমানান নীলকোর্তা চড়িয়ে অন্য মানুষ হয়ে আসে হাজিরা দিতে। চৌকির খবরা-খবর পেশ করে তারা—মার-দাঙ্গা, চুরি-চামারি আর দু-একটা এদিক-ওদিকের খোঁজ-খবর। তারই ভেতর থেকে সুকৌশলে সংগৃহীত হয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ওপরের জন্য তৈরী হয় রিপোর্ট। চৌকি, থানা থেকে লাট দফতর—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ঠাসবুনোন শাসন পদ্ধতি।

কিন্তু পদ্ধতি ঠিকই আছে—নেই শুধু শান্তি। অন্ন-বস্ত্রহীন গ্রাম-গ্রামান্তর। অতএব শৃঙ্খলা,—হয়তো বিপজ্জনক। অতএব—

কি করা উচিত?

সার্কেল অফিসার বিহারী দত্ত প্যাৎলুনের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরের এপাশ-ওপাশ পায়চারী করতে থাকে। অস্থির। কিছুটা বিচলিত।

চৌকির খবরে দুর্দিন—অন্নবস্ত্রহীন গ্রাম।

চৌকিদারেরা শুকনো চাষাড়ে মুখে বলে, 'গ্রামে শান্তি নাই হুজুর।'

সাব-ডেপুটির মেঠো হাকিমী গ্রেড থেকে সার্কেল অফিসে এসে চুল পেকে গেল বিহারী দত্তের। তবু কেমন ভয় করে। ভয় করে—ওপরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। চোখের কোণে একবার কেরানীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—দায়-দায়িত্বের কোন দুর্ভাবনার ছায়াপাত নেই সেখানে। বরং কেমন যেন চাপা হাসির ঝিলিক। হঠাৎ মনে হয়—আহা! ওই রকম নিশ্চিন্ত কেরানী হতে পারতো যদি! এই মুহূর্তে।

বিহারী দত্ত পায়চারী করে শুধু এপাশ-ওপাশ। মুখে ঘাবড়ানো ভাব। সে মুখের দিকে বিব্রত চৌকিদারের দল কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে হাই তুলে চলে এল থানায়।

কিন্তু থানার ব্যাপার জঙ্গী। চৌকিদারেরা সেখানে জুজু। বাপ-মা তুলে খিস্তি খেউড়, চড়টা চাপড়টা হামেশাই জোটে। ভালোতেও শালা, মন্দতেও শালা।

সেখানে ব্যাপার ঘটে চূড়ান্ত। এমনটা হয়নি আগে। চৌকিদারের দল ঘাবড়ে যায়ঃ কি একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গেছে যেন কোথায়।

চার নম্বর ইউনিয়নের চৌকিদার ভীম মণ্ডল তার রিপোর্ট খাতার হলদে ছেঁড়া পাতাগুলো সমেত ছিটকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বারান্দায়।

চৌকিদারদের মুখ বোকা বোকা—চোখে ভয়। ফিস্ ফিস্ করে শুধোয়ঃ

'কি হলো—এ্যাঁ ?'

'শালা ভবানী সাঁতরার বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে।' ব'লে ভীম গায়ের ধুলো ঝেড়ে দলের মধ্যে এসে বসে বিরস মলিন মুখে। যেন দোষটা তারই। বলল, 'বল দেখি তুমরা—আমি এখন কি করি!'

গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেল মেয়েটা শেষ পর্যন্ত। এক টুকরো কাপড় নেই কোমরে। তিরিশ বছরের চওড়া কাঠামোর মেয়ে একটা। ছেলে-পুলের মা—ছেলে ক'টি একেবারে কচিও নয়। তার ওপরে স্বামীর প্রথম পক্ষের বিশ বছরের জোয়ান সেয়ানা এক ছেলে। এদের সামনে ঘর করে সে কেমন ক'রে উলঙ্গ হয়ে! দেশে নাকি কাপড় নেই!

তারপর ···

এক নম্বর ইউনিয়নের সুবাসিনী বেওয়া। জেরা চলে তাকে নিয়ে। নিজের পেটের ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে সে।

'—খুন ?' দারোগার হুংকার!

'খুন লয় হুজুর। ক্ষিদের জ্বালায় মাকে আঁচড়াচ্ছিল—কামড়াচ্ছিল। কিন্তু মুখে তার দেয় কি ? কি আছে ?'

এক দানার সংস্থান নেই। আবার পেটে একটি, আসছে দু-এক মাসের মধ্যে। স্বামী মারা গেছে মাস সাতেক আগে। হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে সুবাসিনী গলা টিপে ধরেছিল ছেলেটার ঃ 'চেঁচা—চেঁচা!' ছেলেটার চেঁচানি যখন থামল তখন নিজে সে গলা ফাটিয়ে ডেকে আনল পাড়া সুদ্ধ ঃ 'হায় হায়! আমি একি করলম গো!'—

আর মাটিতে দুম্ দুম্ কপাল ঠোকা। যেন, নিষ্ঠুর এই এক নম্বর ইউনিয়নের গ্রামের মাটি।

থানা পুলিসের ভয়ে গা ঢাকা দিল সে কোথায় না কোথায়!

'পালালো ?—ছেলেটার লাস ?'

'গ্রামের সবাই পুড়িয়ে দিল হুজুর। তারা বলল—একি খুন না খিদের জ্বালা! আমি ভাবলাম—তা বটে।'

'শালা! হাকিমগিরি ফলিয়েছ—'

এক নম্বর ইউনিয়নের চৌকি পূর্বচক। চৌকিদার মধুনাথ বারান্দায় ছিটকে এসে পড়ল ভীম মণ্ডলেরই মতো। তারপর পাঁচ নম্বর, ছ'নম্বর, সাত নম্বর—ছিটকে ছিটকে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়তে লাগল সবাই দমাদম। কারুর নিস্তার নেই। সংকট ব্যাপক।

এর মাঝখানে তিন নম্বরের গগন দাস হঠাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসে। তার তিরিশ বছরের নোকরি! থানায় গুঁতো খেয়ে গগন দাস সার্কেল অফিসে তার তক্‌মা আর নীল কোর্তা জমা দিয়ে ব'লে এল :

'রইল হুজুর। বুড়া হয়ে পড়লম—চোখে আর দৃশ্য হয় না।'

সার্কেল অফিসারের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। একটা হুলুস্থুল পড়ে যায়। ওদিকে জঙ্গী ঘাঁটি থানার জঙ্গী কায়দা-কানুন আরও তীব্র, আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড় দারোগার গর্জন শোনা যায়। 'শালা বাঞ্চোৎ!—'

চৌকিদারদের মুখে বোবা ভয়। কি একটা কোথায় হয়ে গেছে যেন—অথবা কিছু একটা হবে। নইলে থানাদাররা হঠাৎ অমন ক্ষেপে যাবে কেন? গ্রাম গ্রামান্তরে দুর্দিন—অন্ন-বস্ত্রহীন, দুর্মূল্যতা। অকলঙ্ক শরতের আকাশের তলায় ডাগর ডাগর ঘনশ্যাম ধান গাছগুলো ফুলে ফেঁপে উঠছে বাঁজা মেয়ের মত—নিস্ফলা। ফসলের এখনও দু-মাস বাকী। ধানের দাম আগুন—ক্ষুধার্ত চাষীর নাগালের বাইরে। এদিকে বর্ধিষ্ণু জমি-জমার মালিকের গোলা থেকে ধান বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে—গ্রাম গ্রামান্তরের নদী খাল দিয়ে। ঘুর্ ঘুর্ করছে মহাজনী নৌকো আর ফড়ে। পুরুষেরা বেকার—কাজ খোঁজে। মেয়েরা নিরুপায়—গলায় দড়ি দেয়। হাজা শুকা নয়, দুর্ভিক্ষ নয়! পরিব্যাপ্ত নতুন ধরনের এ এক দুর্দিন। কোথায় নাকি যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে ইংরেজের 'চোখ-কান বোজা ব্যবস্থা।'

সার্কেল অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা পথ ধরলো গগন দাস—গ্রামমুখো। চৌকিদাররা ছেঁকে ধরে তাকে :

'কি হলো—এঁ্যা? কি হলো তুমার? ছেড়ে দিলে কাজ!'

'শুনেছ কখনো?' গগন দাস রুখে উঠল, 'শুনেছ—একটা ভাল মানুষ কখনো বনে-বাদাড়ে তরাস খেতে ছুটে? পেটের জ্বালা কতখানি হলে—'

পেটের জ্বালায় তরাস খেয়েছিল গগন দাসের জামাই হারাধন। মৃতের

প্রেতাত্মার উদ্দেশে চাষা-ভূষোরা তার মরার দিনটিতে গাছের তলায় ভাত দেয় কলাপাতায় করে। ওরা তাকে বলে 'তরাস। সেই তরাস দেখে সন্ধ্যের অন্ধকারে শ্বশুরের ঘরের পেছনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল হারাধন। হঠাৎ জিবের তলায় জল এসে পড়েছিল তার। এক দানা ধান নেই ঘরে, জমির মালিকরা বন্ধ করেছে ধান দাদন—বাজারে দাম চড়া! শ্বশুরের মরা ছেলের তরাস দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। বিধবা জোয়ান বৌটা গাছের তলায় ভাত বসিয়ে দিয়ে কাঁদতে বসেছিল স্বামীর জন্যে। হারাধন অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে পাতা টেনে বসেছিল। ভূতের মতো। এদিকে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে কান্না ফেলে বিধবা মেয়েটা ছুটে পালাল ঘরের ভেতরে। গিয়ে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল।

'কি হলো বৌমা—এ্যাঁ, কি হলো ?'

'ভূ—ভূ—ভূত !'

'ভূত !'

রাতবিরেতে ঘোরা চৌকিদার গগন দাস। ভূতের কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তবু খিড়কীর দিকে উঁকি মেরে দেখে—কে যেন সাপটে পালাচ্ছে খিড়কীর ডোবার পাশ দিয়ে গোলমাল শুনে। শুকনো বাঁশ পাতায় খর পায়ের শব্দ—মর্‌মর্‌ সর্‌সর্‌।

গগন দাস তাড়া করেছিল চৌকিদারী লাঠি নিয়ে। ভূতও ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। লজ্জায়, অপমানে, প্রাণভয়েঃ শ্বশুরের মরা ছেলের তরাস!

ভূতের নাগাল না পেয়ে গগন দাস লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল তাক ক'রে। অন্ধকারে ছোটা ছায়াটা পড়ে গেল হঠাৎ যেন—তারপর আর দেখা গেল না।

দু-দিন বাদে মেয়ের গলা ফাটানো কান্না শুনে গগন দাস জানতে পেরেছিল, জামাই তার মরে গেছে। এক মেয়ে—আদর করে বিয়ে দিয়েছিল গ্রামের ছেলে হারাধনের সঙ্গে, চোখের সামনে থাকবে। খাটিয়ে জোয়ান ছেলে হারাধন—সুখে থাকবে চঞ্চলা। কিন্তু অতো খেটেও সেই নেই নেই। বছরের খোরাক কুলোয় না। অথচ ক্ষেত ভ'রে ধান হয়, লক্ষ্মী যেন উছলে পড়ে মাঠে মাঠে।

গগন দাস আফশোষ করে বলেছিল, 'সময় থাকতে খবরটা দিলিনি একবার মোকে।'

চঞ্চলা ভেজা ভেজা গলায় বলেছিল, 'সে যে বারণ করেছিল বাবা। ভালো মানুষটা গেল ধানের খোঁজে। ফিরে এল বুক ঘষড়ে ঘষড়ে—গামছায় বাঁধা ভাত। বলল—পেট ভরে খা তোর ভায়ের তরাস!'

তরাস। আর ভূত! শুনে গগন দাস থ'মেরে বসে থাকে। মেয়ের কাছে ফাঁস করে না আর কিছুই। তবু মনে মনে জ্বলেঃ শেষে সেই মেরে ফেলল হারাধনকে। খুন করল সে? মনে মনে গুমরে মরেছে গগন দাস। এ-খুন না খিদে? কি রিপোর্ট করবে সে থানায়? তার সাধের চণ্ডলার স্বামী হারাধন মরে গেল অপঘাতে!

শেষ পর্যন্ত থানায় রিপোর্ট দিল এসে, পেটের জ্বালায় মরে গেল হারাধন।

'শুনেছ কখন এসব হাল?—মানুষ ভূতের মত এসে তরাস খায়?' তারপর কেঁদে ফেলে হাঁউমাউ করে, গ্রামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—'এই চৌকিদারী করে গগন দাস অনেক পাপ করেছে, অনেকের চোখের জল ঝরিয়েছে। তাই তার ছেলে গেল, জামাই গেল—নিব্বংশ হল। হ্যাঁ—মানি, অনেক পাপ করেছি আমি। আর জমির মালিকরা—তারা যে ধান দাদন দিল না চড়া বাজারের লোভে? দারোগা বলে আবার, পেটের জ্বালায় মরেনি, রিপোর্ট দে—বৌয়ের চরিত্তির খারাপ ছিল তাই বিষ খেয়ে মরেছে। মোর মেয়ের চরিত্তির খারাপ? বল তোমরা—বাপ হয়ে আমি তাই বলব!'

বুড়ো গগন দাসকে ঘিরে নীলকোর্তার ভীড়। বোকাবোকা, ভয় পাওয়া।

ভীম মণ্ডল ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'মোকেও জিজ্ঞেস করেছিল—ভবানী সাঁতরার দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে তার জোয়ান সেই সৎ ছেলেটার খারাপ কোন সম্পর্ক ছিল কি-না। বলে কি—স্বামীটা তো বুড়া!—হতে পারে। তার'পর বলছিস—গায়ে কাপড় ছিল না। ছোটলোক তো!'

'তোবা তোবা।' তিন নম্বর ইউনিয়নের রমজান শেখ বলে উঠল, 'হাজার হোক—বাপের সাদি করা বৌ। মা।—জননী!'

'ব্যাপার দেখে শুনে শেষমেস আমি বললাম', বেঁটে ছোকরা মতো একজন বলে উঠল, 'মোর কোন খবর নাই হুজুর। মাঠে ধান গাছ চেড়ে একগলা হয়ে গেছে। আর জোর মাস খানেক—ধান উঠে যাবে। মোকে কিছু আর বলল নি। বরং বলল—বাঃ বাঃ। এই তো চাই।'

'মর শালা—নিব্বংশ হ।' গগন দাস অভিসম্পাত দিল। কাকে দিল বোঝা গেল না।

বেলা শেষ হয়ে এলো। চৌকিদারেরা ছোট ছোট দলে পথ ধরেছে গ্রামের। জনা চারেকের নীলকোর্তা পরা একটি দল সোজা এগিয়ে চলেছে সড়ক ধরে। ওরা একই অঞ্চলের লোক। মাঝখানে খালি গায় শুধু গগন

দাস। সবাই কথা কইছে। বুড়ো গগন শুধু চুপ। কি যেন ভাবছে। থানায় আজ হঠাৎ কি একটা হয়ে গেল যেন।

পায় পায় ছোট দলটি হেঁটে এলো বহুদূর। এসে থামল খেয়া ঘাটে। নদী পেরোবে। পাকা সড়ক, দালান কোঠা, বাজারগঞ্জের বৈচিত্র শেষ হয়ে গেল এপারে। ঘাড় বাঁকা গোঁয়ার মেয়ের মতো খরবেগ এক নদীর খাড়া পাড় বেয়ে উঠে ওপারে মহাল নদীচর। মাইলের পর মাইল ছুটে যাও—একটি ভাঙা ইটের টুকরোও পড়বে না চোখে। শুধু দিগন্তবিসারী ধানক্ষেত। ঠাণ্ডা। নিঃশব্দ।

দল ভেঙে গেছে। নদী পেরিয়ে চারজন চলে গেল চার মুখো। গগন দাস পথ চলেছে অন্য মনে—বুড়ো বুড়ো পা ফেলে। লম্বা চওড়া চেহারাটা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে একটু। হাতে লম্বা লাঠি। ভেড়ি বাঁধের দু-পাশে ধানক্ষেত—ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। তার মেয়ের মুখের মতো। শান্ত। ঘনশ্যাম।

'··· কাঁচা বয়সে মেয়েটা বিধবা হয়ে গেল গ' !'

বুকভরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গগন দাস। ছেলে মরে যাওয়ার পর অনেক কথা ভেবে রেখেছিল সে—আশা আশ্বাসে ভরা বুড়ো বয়সের সুখ শান্তির কলরবে মুখরিত সংসার একটু। আর বেশী কিছু না।

ভেড়ি বাঁধের একটা বাঁক ঘুরতেই অন্যমনস্ক গগন থমকে দাঁড়ালো। তাকে দেখে হঠাৎ কে যেন ভেড়ি বাঁধ থেকে নেমে সর্ সর্ করে নেমে গেল ধানক্ষেতের মধ্যে। পুরানো চৌকিদারী গলায় অভ্যস্ত হাঁক হেঁকে উঠল গগন :

'কে র‍্যা !'

কোন সাড়া নেই আর।

'দেবো লাঠি পিটে—বেরিয়ে আয় বলছি।' গগন এগিয়ে গেল। তিরিশ বছরের কড়া হুঁশিয়ার লোক।

সুবাসিনী ধরা পড়ে গেল শেষকালে পাঁচ দিন পরে। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল ধানক্ষেতের ভেতর থেকে। যেন বুনো মানুষ একটা। শুধু উঁচু পেটটার ওপরে জড়ানো ছেঁড়া কাপড় একটু। হাতে একটা পুঁটলি।

পুরানো অভ্যাস বশে গগন হাত বাড়াল আগে পুঁটলিটার দিকে, 'কি আছে ওতে—দেখি।'—বলেই সে হাতটা সরিয়ে নেয়। মনে পড়ে যায় হঠাৎ, উর্দি আর তকমা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে আজ সে। তিরিশ বছর পরে। ও আর ছোঁবে না।

কিন্তু সুবাসিনী কাঁপতে কাঁপতে পুঁটলিটা খুলে ধরলো গগনের সামনে—ছেঁড়া কাপড় একখানা, ক্ষয়ে যাওয়া কালচে পড়া রূপার পৈঁচা এক জোড়া। একটা শামুক—পথে বিপথে ছেলে হলে নাড়ি কাটবে। দিশী দু-একটা ওষুধ শেকড়-বাকড়, ছেলে হওয়ার পর শরীর গরম রাখার জন্যে।

গগন চেয়ে চেয়ে দেখছে। সুবাসিনী সে চোখের দিকে চোখ তুলে একবার তাকাতেও সাহস পাচ্ছে না। ধরা পড়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

গগন বলল, 'কোথায় যাবি ?'

সুবাসিনী এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল শুধু, 'জানিনি।'

'তবে ? ভারি মানুষ তুই ! এখন যাচ্ছিলি কোথায় ?'

'ঠিক নাই।'

ঠিক নাই। ঠিকানা নাই। ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনঘোর হয়ে আসছে গ্রাম গ্রামান্তর জুড়ে। নারকেল আর তাল বনের দাঁড়ি আঁকা গ্রামগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সেই অন্ধকারে। শরতের প্রশান্ত সন্ধ্যায় মাঠের মাঝখানে ভেড়ি বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের মেয়ে চঞ্চলার কথা মনে পড়ে যায় গগনের।—মেয়েটার ইনিয়ে-বিনিয়ে সেই চাপা কান্না !···

'যা—পালা, থানা পুলিস হবে। বুঝলি ? পালা।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গগন বলল আস্তে আস্তে।

সুবাসিনী আবার পুঁটলি বাঁধে। হাত কাঁপে তার।

তাকে পেছনে ফেলে গগন এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে। তিরিশ বছর পরে একটা অপরাধীকে ছেড়ে দিল সে। যাক্, জ্বালা ধরা মনে কেমন প্রশান্তি আসে হঠাৎ। তকমা আর নীল উর্দিটা জমা দিয়ে এসেছে সে চিরদিনের জন্যে। আর কোনো দিন সে ও-মুখো যাবে না—খেয়া পার হবে না।

কয়েক পা এগিয়েই সে কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগল সুবাসিনীকে—তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে গ্রামে, আশ্রয় দেবে নিজের ঘরে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কোথায় যাবে গ্রামের মেয়ে একটা এমন দুর্দিনে ! গগন দাস পাগলের মত মাঠময় খুঁজে বেড়ায় সুবাসিনীকে। খুঁজে-পেতে তাকে সঙ্গে করে ফিরে এলো গ্রামে। কৌতূহলী গাঁয়ের মানুষের মুখের দিকে চেয়ে বুড়ো বলল :

'ফিরিয়ে আনলম অকে। কোথায় যাবে বল ? ও রইল মোর মেয়ার মতো। থানা পুলিস হলে তুমরা কেউ ব'লনি অর কথা। কি বল ?'

'ঠিক কথা চৌকিদার। অর দোষ কি? ক্ষিদার জ্বালা বড় জ্বালা গো! অর দোষ কি?'

'তবে থাক বেটি।—কোথায় যাবি?' বুড়ো মুখটা গগন দাসের অদ্ভুত দেখায় হাসিতে—আনন্দে! পরিতৃপ্ত। তার মনে হতে লাগল—অনেক পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত সে করতে পারল এতদিনে।

'হাঁ, থাক।' গ্রামের মানুষের গভীর গলার আশ্বাস: 'মোরা তো আছি।'

কিন্তু ওপারে চাঞ্চল্য। দিন কাল খারাপ। ক্ষুধার্ত গ্রামগুলো মরিয়া। থানা সার্কেল অফিস ঘিরে পাশাপাশি আরও গুটি কয়েক সরকারী অফিস আছে—ঋণ সালিশী বোর্ড, পোস্ট অফিস, সরকারী ডাক্তারখানা ইত্যাদি। সব গুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সিকি মাইলের মধ্যে এক আধা শহরে পত্তন—দালান কোঠার ভিড়, গ্রামের জোত-জমির মালিকদের আস্তানা। সেখানে একটা কথা ঘোরে মুখে মুখে লাগাম ছেঁড়া পাগলা ঘোড়ার মত: গ্রামের চৌকিদাররা তকমা আর উর্দি ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে অফিসারদের মুখের ওপরে! গঞ্জবাজারে, দালান কোঠার বৈঠকে, ঘাপটি মারা ছোট ছোট চা-খানাগুলোয় গুজবের গাঁজলা ওঠে: দিনকাল বড় খারাপ—নদীর ওপারের মরিয়া গ্রামগুলো কিছু একটা ক'রে বসবে। সাংঘাতিক! নির্মম! খুন করে লাস পুড়িয়ে দিচ্ছে তারা বে-মালুম। একজোট হয়ে খুনীকে দিচ্ছে আশ্রয়। নোকরি ছেড়ে চৌকিদাররা জুটছে গিয়ে তাদের সঙ্গে। হাজার রকমের কথা ভয়াবহ হয়ে ওঠে দিনে দিনে।

বিহারী দত্ত বদলীর আবেদন ক'রেছিল গোপনে—কেরানীরা তা-ও ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

'সায়েব পালাচ্ছে।'

সবটা কেমন নড়বড়ে। থমথমে মনে হয় হঠাৎ। মনে মনে ওৎ পেতে আছে বিহারী দত্ত—বদলীর হুকুমটা এসে পড়লে হয়!

থানা অফিসার হেসে বলল, 'চলে যাচ্ছেন নাকি শুনলাম?'

'হুঁ! পেট খারাপ। মানে এখানকার জলে হজম হচ্ছে না ভাল। অতি বাজে, এঁদো জায়গা।'

'লোকগুলোও ভাল না। কি বলেন?' কথাটা বাঁকাভাবে বলে হাসল দারোগা।

বিহারী দত্ত কিন্তু কথাটাকে লুফে নিল অন্যভাবে। আবেগে বলে উঠল, 'ঠিক ধরেছেন, সাংঘাতিক লোক। থানা ভাঙে, ডাক লুঠ করে—

অফিসারদের ধরে ধরে দ্বীপান্তর দেয়। সে একেবারে কোথায়—সুন্দরবনে! সুন্দরবন থেকে ঘুরে ঘুরে কলকাতা গেছি মশায় একবার—একবম্বে, জানেন? চুপ করে থাকতে থাকতে এমন কাণ্ড করে বসে হঠাৎ! সাংঘাতিক!'

ঘরপোড়া গোরু।

দারোগা হেসে বলল, 'ঘাবড়াবেন না।'

তবু ঘাবড়ায় বিহারী দত্ত, ঘাবড়ায় জোত-জমির মালিকরা। ক্ষুধার্ত গ্রামগুলো কিছু একটা করে বসবেই।

মানুষ খুন ক'রবে, গোলা লুঠ ক'রবে, গ্রামে ঢুকতে দেবে না। হয়তো থানা ঘেরাও করবে। মিছিল ক'রে আসবে নদী পেরিয়ে—গুলীর পরোয়া করবে না। এর মধ্যে কয়েক জন চাষী এসেছিল ঋণ-সালিশী বোর্ডে। সর্বসান্ত হয়ে দলিল-পত্র সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে সড়ক দিয়ে যেতে যেতে চোরের ঘাঁটি বলে গাল দিয়ে গেছে। জোত-জমির মালিকদের চোখে ভয়। একমাত্র ভরসা জঙ্গী ঘাঁটি—থানা। সেখানে তারা কেউ একলা আসে, কখনো আসে দল বেঁধে সন্ধ্যের পরে। অনুরোধ করে:

'ব্যাপার যে গুরুতর—কিছু একটা করুন মশাই!'

দারোগা হেসে বলল, 'হল কি যে করব কিছু।'

'কি সব শুনছি!'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় কি?'

'ওদিকে সব লুঠ হয়ে যাক—জমি, ধান, কারবার!'

'মগের মুলুক! থানা পুলিস মরে গেছে নাকি!'

'পুলিস যদি গুলী না করে? তেমনও তো হচ্ছে!'

তেমনও হচ্ছে। দিনকাল খারাপ! বিশ্বাস টলছে। আতঙ্ক বাড়ছে। আর অজ্ঞাতপূর্ব কি একটা গড়ে উঠছে যেন দুর্জ্ঞেয় ওপারের মানুষের মধ্যে। সিকি মাইল ব্যাপী আধা-শহুরে জায়গাটুকু কিছু একটার আশঙ্কায় থমথম করে। জটলা হয়। এক কথা: নদীর ওপারে কি যেন হয়ে যাচ্ছে অজ্ঞাতে। ক'জন অচেনা নেতা গোছের মানুষ খেয়া পেরিয়েছে কবে, মরিয়া নোংরা মানুষের দল মাতব্বরদের নিয়ে সমিতি গড়ছে—পথ খুঁজছে। ক'জন চৌকিদার নাকি আরও মতলব আঁটছে ওপারে—তকমা উর্দি ছুঁড়ে দিয়ে যাবে মুখের ওপরে।

চৌকিদাররা শ্রান্ত বিষণ্ণমুখে দল বেঁধে আসে এপারে হাজিরা দিতে। গগন দাসের মতো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তকমা উর্দি কেউ ছুঁড়ে না ফেললেও—কোনো আশ্বাস নেই তাদের চোখে মুখে। কেমন পিট্‌পিট্ ক'রে তাকায়

সবাই ঃ চেপে চেপে যেন কথা বলে। কম কথা বলে। তাদের মুখে শুধু অন্নবস্ত্রহীন গ্রামের কথা—ব্যাপক সংকটের কথা। আর, কোন খোঁজ নেই সেই খুনী সুবাসিনীর। কোন খোঁজ নেই বিদ্রোহী গগন দাসেরও। সবটা ওদের চাপা চাপা।

হঠাৎ একদিন আরও নতুন এক খবর ছড়িয়ে পড়ল ঃ কোন জোতদারের গোমস্তা খাজনা আদায় করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে এপারে। ফেলে আসতে হয়েছে ওপারে তার ভোজপুরী পাইককে।

শেষ পর্যন্ত জঙ্গী ঘাঁটির টনক নড়ল। 'পাইক গায়েব!'

দারোগা হেসে সার্কেল অফিসারকে বলল, 'পাখী শিকার করতে যাবেন নাকি স্যার?'

বিহারী দত্তের বদলীর হুকুম আসেনি—মন খারাপ। বৌ-ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে দেশে তাড়াহুড়ো ক'রে। কোনোরকমে মুখে একটু হাসি টেনে বলল, 'কোথায়?'

'নদীর ওপারে!'

'আপনি যান—আমার কাজ আছে মশায়। জরুরী কাজ।'

বেশী কথা কয় না। ফাইলের মধ্যে বিবর্ণ মুখ লুকাল বিহারী দত্ত।

নদীর ওপার। নোংরা মানুষ—ক্ষুধার্ত আর হিংস্র। জঙ্গল-জালপাই মহাল। দুঃস্বপ্নের মতো।

একদিন বিকেলের শেষ-খেয়ায় পার হলো একদল পুলিস ফৌজ। ঘাঁটি গাড়ল গ্রাম ঘিরে। রাতের অন্ধকারে।

বুনো গ্রাম। অন্ধকারে মনে হবে বিভীষিকার মতো। একটি আলোরও চিহ্ন নেই দিগন্ত পর্যন্ত। প্রশান্ত নির্মেঘ শরতের আকাশের তলায় পাৎলা অন্ধকারে ঢাকা একটা ভূখণ্ড—মাঝে মাঝে গাদাগাদি টঙের মত কুঁড়ে, দূর থেকে মনে হবে ছোট ছোট যাযাবর বেদের তাঁবু। যেন ওঠ বললেই ওঠো। ওগুলোর আকারে আকৃতিতেও যেন কোনো স্থায়িত্ব নেই। সবটা জন-কলরবহীন। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটি ভাগাড়ে-কুকুরের ডাক কাঁপে অন্ধকারে। ভুল হবে, বুনো গ্রামের কান্নার মতো।

সেদিন শেষ রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একটা হল্লা উঠল আকাশে—আর্তনাদের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে। ঘুম-চোখে বিছানা থেকে টানা-হেঁচড়া হয়ে ক্ষুধার্ত নোংরা মানুষগুলো চায় বোকা বোকা চোখে ঃ ফেরারী চাই! খুনী চাই!

'বাঃ! ফেরারী কে! খুনী কে!' ওরা বোকার মতো বলাবলি করে।

কিন্তু থানার জঙ্গী কায়দা-কানুন অন্যরকম। বন্দুকের কুঁদোর গুতোয় দম চাপা গোঙানী আর হাওয়ায় বেপরোয়া গুলীর পট্‌পট্‌ শব্দ, মেয়েলী গলার কান্না আর বাচ্চা ছেলের আর্তনাদ। ঘুমন্ত গ্রাম জেগে উঠে সবটা ভালো ক'রে বোঝাবার আগে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অতর্কিত আক্রমণে। শুধু ধরা পড়ে গেল প্রথম ধাক্কায় কয়েকজনা। মার খাওয়া মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কোনরকমে ঃ

'খুনী! আমরা কি জানি!'

'সেই ফেরারী ··· চৌকিদার গগন দাস? কোথায়?'

'জানিনি।'

'সুবাসিনী বেওয়া?'

'জা-নি—নি।' অবসন্ন গলার শেষ গোঙানী কাতরে কাতরে ওঠে এখানে ওখানে।

পাত্তা নেই সুবাসিনীর, পাত্তা নেই গগন দাসের। অতবড় মোটাসোটা ভোজপুরী পাইকটার চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। সারা গ্রামটাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘিরে চষে ফেলল বুটে, বেয়নেটে, গোঙানী আর আর্তনাদে।

কুঁড়েগুলো সব খালি। ভাঙা হাঁড়ি-কুঁড়ি—ভাঙা ঘর-সংসার। ছাই পাঁশ আগুন। তার ওপরে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে কুৎসিত বিভীষিকার মতো।

সেই উষ্ণ আলোর দিকে একটু ঘেঁষে বসল সুবাসিনী। ঝোপের গাছ-পালার আড়াল দিয়ে রোদ এসে পড়েছে একটু।

ছেলেটা কেঁদে উঠল হঠাৎ নাড়া খেয়ে।

'ওঁয়া—ওঁয়া।'

কাছাকাছি শিকার ধরা পড়ার উল্লাস উঠল যেন। কাছাকাছি বুটের শব্দ। হল্লা এগিয়ে আসছে। ছেলেটার মুখে মাই গুঁজে দিল সুবাসিনী তাড়াতাড়ি। হঠাৎ নাড়া খেয়ে আরও জোরে ওঠে কান্নার শব্দ। হল্লা বাড়ছে। খুব কাছে।

সুবাসিনী হাত চাপা দেয় এবার ছেলেটার মুখে। দম বন্ধ হয়ে কাঁপছে ছেলেটা থরথর ক'রে, হাত-পা ছুঁড়ছে—নীল হয়ে উঠছে কচি কচি মুখটা। সুবাসিনী চেয়ে আছে সভয়ে। দম আটকে আসছে দম আটকে মরা সেই আর একটা ছেলের মতো। এখুনি হয়তো থেমে যাবে সেই রকম। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কাঁপতে কাঁপতে। মরা ছেলের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের

সামনে। হাত তুলে নিল। তারপর ফুঁপিয়ে উঠল সে নিজেই। ঠাণ্ডা ঝোপের অন্তরাল থেকে বাইরে সূর্যের আলোয় দমকে দমকে তখন ছড়িয়ে পড়ছে তাজা একটা শিশু কণ্ঠের কান্না।

সুবাসিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা মুখে যখন চোখ তুলে তাকাল তখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দু-জন সেপাই, পাথর মুখ। খুনী সুবাসিনীর মুখে খুন হওয়ার আতঙ্ক।

রোদে ঝকমক করছে বেয়নেট। পেছনে চৌকিদার মধুনাথ।

'এ কে ?'

মধুনাথ জবাব দেয় না কোনো।

'কে ? নাম কি এর ?' চড়া গলার হুংকার। বেয়নেট তার বুকের কাছে। তোতলার মতো মধুনাথ বলল ঃ

'সুবাসিনী বেওয়া।'

জান্তব গর্জনের মতো একটা উল্লসিত হল্লা ঝোপের ভেতর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে যায় আকাশে।

'ওঠ্ হারামজাদী।'

টেনে তুলল দু-জন একটা ঠাণ্ডা কাঁপা উলঙ্গ নারী দেহকে। কাটা রক্তাক্ত ঠোঁটে শেষ রাত্রির প্রসব-বেদনা চাপার ভয় পাওয়া চিহ্ন। রক্তের দাগ তখনও শুকোয়নি শিশির ভেজা মাটি থেকে।

'চল হারামজাদী। গগন দাস কোথায় ?'

পেছনে ধাক্কা। সুবাসিনী টলতে টলতে এগোল দু-পা। তারপর পড়ল হুমড়ি খেয়ে। একটা খোঁচা খাওয়া জানোয়ারের মতো ককাতে লাগল কুঁকড়ে কুঁকড়ে।

'ওঠ্ ওঠ্ মাগী—চল্ সিধা—'

দুটো সঙ্গীনের ফলা উঁকি মারছে মুখে, পেটে।

গ্রামের মাটিতে মুমূর্ষু কান পেতে শুনল সুবাসিনী—কে যেন ভয় পাওয়া গলায় এসে বলল ঃ থানার সবগুলো পারানী নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে কারা যেন।—একটাও নেই।—কারা যেন ছুটে গেল। বুট পরা পায়ের শব্দ। দ্রুত—শঙ্কিত। আহা, ছেলেটা কাঁদছে এখনও কোথায়। কেউ কি শুনতে পাচ্ছে না! ··· সুবাসিনী যে হাত পা আর নাড়াতে পারছে না—মাথার ভেতরে কেমন ঝিম্ ধরে আসছে যে! ···

গ্রামনগর ॥ ১৯৫০

সওয়াল

শীতের সকাল। মহকুমা শহর থেকে একটি ট্যাক্‌সি এসে অবনীমোহনকে ভোর ভোর খেয়াঘাটে পৌঁছে দিয়ে গেল। সঙ্গে দু-জন সহযাত্রী—তাদের সাধারণ বেশবাস আর শীতের পোশাকে সমৃদ্ধির চিহ্ন, পাকা বয়সের লোক প্রায় সবাই। দূরবিসারী শূন্য মাঠের শেষে তখন ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে ছাব্বিশে জানুয়ারীর সূর্য সবে উঠছে। উনিশশো সাতচল্লিশ সাল।

অবনীমোহন গাড়ী থেকে নেমে সামনে তাকালেন। কিসের যেন একটা অভাব অনুভব ক'রলেন। খেয়াঘাটের কাছে অপেক্ষমান বেশ একটা ভিড় আশা করেছিলেন তিনিঃ গ্রামের কৌতূহলী কৃষক, কাচ্চাবাচ্চা, স্ত্রীলোক—যেমন বছরের পর বছর ধরে ঠিক এমনি দিনে, এমনি সকালে দেখেছেন। খেয়া পেরিয়ে গিয়েছেন ওপারে গ্রামের পথে, সদলে। ফুলের মালা এসেছে, শাঁখ বেজেছে, ঘন ঘন উঠেছে 'বন্দেমাতরমে'র ধ্বনি। রাজার হাট। সেখানে পতাকা তুলেছেন—নিয়েছেন স্বাধীনতা দিবসের শপথ।

সামনে কিন্তু জনা কয়েক মাত্র লোকের জটলা—অবনীমোহনের সহযাত্রী দুটির মতই কয়েকজন ভদ্রলোক। তাদের ভেতর থেকে একটি পুলিস অফিসার এগিয়ে এল অবনীমোহনের দিকে—পেছনে জন তিনেক বন্দুকধারী সেপাই, আর কয়েকজন নীলকোর্তা পরা চৌকিদার।

পুলিস অফিসার হেসে নমস্কার ক'রল। ব'লল, 'চলুন তা হ'লে খেয়া পেরোই।'

অবনীমোহন নীরবে তাঁর দু-জন সহযাত্রীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। এমন দিনে এমনিভাবে এই পুলিসের দারোগা নামক লোকটিকে তিনি যেন আশা করেননি এখানে।

কিন্তু অমায়িক হেসে একজন পরিচয় করিয়ে দিল, 'চেনেন না? উনি হলেন আমাদের থানা অফিসার।'

তারপর ছোট দলটি এগিয়ে চলল খেয়া পেরোতে। টুক্‌টাক্ কথা কইছে সকলে। দারোগাটি ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে বলে চলেছে তার একটি ডিঙি নৌকো জোগাড় করার আশ্চর্য কাহিনী : নৌকোর দাঁড়িমাঝি গ্রামের চাষাভুসো—তারা কেমন ক'রে নৌকো লুকিয়েছে, কেমন ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে আর কেমন ক'রে সেপাই ফৌজ দিয়ে আশ্চর্যভাবে দারোগা তাদের পাকড়াও ক'রেছে। অবনীমোহন নীরব। দারোগার বক্‌বকানির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মনে হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে গতকাল সন্ধ্যের একটি ব্যাপার আর অমলের কয়েক ছত্র চিঠির তীব্র কয়েকটা কথা।

অমল ফেরার—বহুদিন কোন খবর ছিল না তার। উদ্যত হ'য়ে আছে পুলিসের হুলিয়া। হঠাৎ কাল সন্ধ্যের অন্ধকারে চৌকিদারের পোশাক পরা একটি লোক ঘরে এসে সাবিত্রীর হাতে এক টুকরো চিঠি তুলে দিল। অমলের ফেরার হওয়ার পর বাড়ীতে থানা পুলিসের অনেক হ্যংগামা গেছে। চিঠিটুকু কম্পিত হাতে পড়তে লাগলেন সাবিত্রী। তারপর সেটি অবনীমোহনের হাতে তুলে দিয়ে পত্রবাহকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ব'লেছিলেন :

'তুমি তা হলে চৌকিদার নও !'

'না মা, এ মোর ভাইয়ের পোশাক—লুকিয়ে পরে এসেছি। এমনি এলে ধরে গারদে পুরে দেবে যে !··· যদি চিনতে পারে !'

লোকটি চিঠি দিয়েই চলে গেল তক্ষুনি।

কয়েক ছত্রে অমল তার মাকে লিখেছে :

"শুনলাম, আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারী বাবাকে এখানে নিয়ে আসবার মতলব আঁটছে জোতদার মালিকেরা। ভালই হবে। গ্রামের চাষাভুসো ফসলের লড়াইয়ে ভাল ক'রে চিনেছে তাদের মালিকদের, চিনেছে পুলিসকে। সে সারিতে দরকার এখন একজন বুড়ো জাতীয় নেতার। বাবাকে ব'লো, বন্দুকের গুলী একটা হাতে এসে লেগেছিল—তাছাড়া ভালই আছি।"

কাল সন্ধ্যের ঘটনা হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে অবনীমোহনের মনে।

খেয়া পেরিয়ে যেতে হবে ক্রোশ তিনেক নৌকোয়। খালের মুখে নৌকো আছে। সে দিকে এগিয়ে চলল ছোট দলটি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সবাই। অবাক হ'য়ে তাকাল দারোগার দিকে। লোকটা খেজুর-রস খাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ চলতে চলতে।

পথের পাশের একটা খেজুর গাছ থেকে বছর পনেরোর একটি ছেলে

খেজুর রসের কলসী নামিয়েছে। একটি আধা বয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল ছেলেটির পাশে। দারোগার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই, কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ রসের ভরা কলসীটা উপুড় ক'রে দিল মাটিতে।

দারোগা হুংকার দিয়ে উঠল, 'এই পাকড়ো মাগীকে।'

সঙীন তুলে দু-জন সেপাই এগিয়ে গেল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল নির্বিকার। শান্ত সহজ গলায় ব'লল ঃ

'পড়িয়া গেল তো কি করব।'

দাঁত খিঁচিয়ে উঠল দারোগা, 'নিজেই তো ফেলে দিলি খান্‌কি মাগী। দেখাচ্ছি তোর তঁ্যাদড়ামি। বল হারামজাদী—কোথায় তোর স্বামী ?'

'সে তো এ দেশে নাই।'

'এ দেশে নাই, না ধান লুঠ ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে—এঁ্যা !' দাঁতে দাঁত চেপে দারোগা ব'লল। 'সব ঝুঁটি ধরে এনে ঢোকাব গারদে—বুঝবি তখন হারামজাদী।'

মেয়েলোকটি চেয়ে আছে শান্ত—অবিচলিত, কঠিন চোখে।

দল এগোল।

ওই কিসান মেয়েটার দিকে চেয়ে চেয়ে আর একটি মেয়েকে মনে পড়ে যায় অবনীমোহনের—ওই রকম শান্ত—অবিচলিত, কঠিন। লবণ-আইন ভাঙার আন্দোলন—তাকে দমন করবার জন্যে চলেছে ব্যাপক ধরপাকড় আর উৎপীড়ন। হাটের ওপরের বাজে মেয়েমানুষ পদ্মা—কয়েকজন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবককে আশ্রয় দিয়েছিল ব'লে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। তারপর সওয়াল আর পীড়ন ঃ

'কেন থাকতে দিয়েছিস ?'

'ঘর আছে তাই ভাড়া দিয়েছি।'

'ভাড়া !··· তোর ভাড়া খাটান শেখাচ্ছি হারামজাদী।'

পরের দিন পদ্মাকে পাওয়া গিয়েছিল অজ্ঞান অবস্থায় এক মাঠের পাশে ঃ গালে আর বুকে খ্যাপা পশুর দাঁতের ছোবল—সারা কাপড়ে রক্তের দাগ। আজ বহুদিন পরে চাষীর ঘরের শান্ত একটি বৌয়ের চোখেও সেই পদ্মার জাতকে দেখলেন অবনীমোহন। কঠিন আর অবিচলিত।··· বহুদিন হ'ল পদ্মা মারা গেছে—প্রতাপদীঘির পদ্মা। তবু পদ্মারা বুঝি চিরজীবী। নিঃশেষ হয়না কখনো।

খালের মুখে এসে পড়েছে দলটি।

অবনীমোহনের পুরানো কথার খেই হারিয়ে গেল আবার দারোগার

চেঁচামেচিতে। লোকটা হিন্দী আর বাঙালাতে মিশিয়ে পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠেছে :

'আভি পাকাড়কে লাও শালাদের।'

'কি হ'ল!' অবনীমোহন অবাক হলেন।

দাঁড়ি-মাঝি ডিঙিটাকে ফেলে পালিয়েছে কখন।

'এখন খুঁজে আর লাভ কী!' দলের ভেতর থেকে একজন ব'লে উঠল, 'তার চেয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক—বেলা হ'ল। আপনার চৌকিদাররা গুণ টানতে পারবে না?'

'পারবে না কেন? এই—টান শালারা। ডাকাত ব্যাটাদের বেঁধে রেখে গেলি না কেন? চিনিস তো ব্যাটাদের!'

চৌকিদারগুলো সভয়ে তাকিয়ে ছিল দারোগার দিকে—কাজের হুকুম পেয়ে দড়াদড়ি নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। আর তফাতে গিয়ে গজগজ করতে লাগল, 'ই শালার কি পাপ করলে চৌকিদার হয় রে বাপ্।'

অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে দারোগা ব'লে উঠল, 'দেখলেন তো শালাদের কাণ্ড! আজ সভা।—কাল তামাম হাটে হাটে ঢেঁটরা পিটে ব'লে দেওয়া হয়েছে যে আপনি আসছেন। দেখুন শয়তান শালাদের কাণ্ড! ওরা ডাকাত মশায়—স্রেফ ডাকাত। আপনাদের মতো তাবড় তাবড় নেতাদের আর মানেটানে না।'

অবনীমোহন শান্ত কণ্ঠে ব'ললেন, 'গ্রাম থেকে লোক পাওয়া যাবে না?'

'পাবেন? ওই সবগুলো সেপাই চৌকিদার পাঠিয়ে সারা গ্রাম চুঁড়ে ফেললেও একটা লোককে খুঁজে পাবেন না আপনি। গিয়ে দেখবেন—শুধু মেয়েমানুষ আর কাচ্চাবাচ্চা।'

অবনীমোহন শোনেন আর মনে পড়ে যায় নিঃশব্দ প্রতিরোধের আরও কতকগুলো দিন : ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন। এমনি গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে গা ঢাকা দিয়েছে সবাই। পিটুনী পুলিসের দল এসে রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম ঘিরে ফেলেছে—ছেলেমেয়ের হাত ধরে কুকুর-বেড়ালের মতো বনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ধনী নির্ধন সবাই। ট্যাক্সের জুলুমটা চলছে তখন ধনীদের ওপরেই। তারা আগে ভাগে ঘর-ছাড়া।

শুধু ধরা পড়ে গিয়েছিল বছর বারো বয়সের এক কিশোর—চিন্তামনিপুরের পচা।

'তোদের লোকজন কোথায়?'

পচা বলেছিল, 'জানিনি।'

'তোদের গ্রামের বড়লোক কে ?'

'শশীবাবু ।'

'সে কোথায় ?'

'জানিনি ।'

'জানিসনি শালা !'—

তলপেটে ভারী পায়ের বুটের লাথি খেয়ে পচা চিৎ হ'য়ে উল্‌টে পড়েছিল—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এসেছিল এক ঝলক। সে অনেক দিনের কথা। চিন্তামনিপুরের চাষাভুসোরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল পচাকে। মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে।···

দারোগা চেঁচিয়ে উঠেছে আবার ঃ

'এই—লাগল লাগল। শালারা দেখে টান !'

মাথা বেঁকে নৌকোটা ঠেকেছে গিয়ে একেবারে খাল পাড়ের ওপরে। ঠেলাঠেলি ক'রে চৌকিদাররা নৌকোটাকে ঠেলে আবার জলে ভাসিয়ে দিল।

নৌকো চলল আবার।

খালের দু-ধারে শূন্য মাঠের পর মাঠ। ফসল উঠে গেছে। অবনীমোহন সেইদিকে চেয়েছিলেন নীরবে। মনের মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে অসংখ্য কথা—একটি বুড়ো নেতার জীবনের অনেক দিনের কথা। 'বুড়ো নেতা'—অমলের চিঠির তীক্ষ্ণ কথাটা বারবার খোঁচা মারে মনে।

কে একটি লোক আসছে এগিয়ে। গ্রামের কিসান কিসান মনে হয়—শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কান মাথা ঢেকে নোনা জলের কষধরা একটা গামছা জড়িয়েছে কয়েক ফেরতা। লোকটাকে দূর থেকে দেখে হঠাৎ মনে মনে খুশি হ'য়ে ওঠেন অবনীমোহন। এতক্ষণ যেন এই রকম একটি লোককেই খুঁজছিলেন তিনি—তাঁর পরিচিত গ্রাম-দেশের সাধারণ মানুষগুলি। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল তাঁর—অনেক দিনকার চেনাজানা গ্রামের সেই লোকগুলি সবাই যেন অমলের মতো লুকিয়ে গেছে কোথায় নিঃশব্দে, তাঁর সামনে অদৃশ্য প্রতিরোধের একটা দেয়াল তুলে দিয়ে।

দূরে হঠাৎ লোকটি থমকে দাঁড়াল নৌকোটার দিকে চেয়ে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর পেছন ফিরল লোকটি—ঝুপ্‌সি একটা কেয়াবনের আড়ালে দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

'এক শালা ডাকু ভাগতা হ্যায়।' একটা সেপাইয়ের চোখে পড়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠেছে।

অবাক হয়ে চেয়ে আছেন অবনীমোহন। সবটা যেন বুঝতে পারছেন না তিনি। ডাকু? ডাকাত!…

তারপর প্রশান্ত শীতের সকালে রোদে পিঠ দেওয়া নিস্তব্ধ প্রান্তরের ধ্যান ভেঙে সেপাইদের বন্দুকের শব্দ হ'লো—একটা। দুটো।…

লোকটাকে আর দেখা গেল না। শুধু নিঃশব্দ শূন্যতা ভরে যায় নিরবচ্ছিন্ন শাঁখের শব্দে—সারা দিগন্ত জুড়ে, আকাশ জুড়ে, চারিদিকের প্রান্তর জুড়ে।

দারোগা দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'শুনছেন শালাদের সাইরেন।—কত বাজে দেখবো রে শালা!' অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে ব'লল, 'দেখলেন কাণ্ডটা! হাড়বজ্জাত এই গ্রামের ডাকাত শালারা। সেদিন দুজন সেপাই গিয়েছিল মশায়—তাদের ঘিরে এক ঘরে পুরে আগুন লাগিয়ে দিলে। আমিও এর পাল্টা শোধ নেবো! শুধু গোটা তিনেক ঘর পুড়েছে, এবার গ্রামকে গ্রাম জ্বলবে!'

গ্রাম জ্বলছেও। অবনীমোহন তাকিয়ে দেখলেন—গাছপালার আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে পোড়া কুটিরের সারি। সবুজ গাছপালাগুলো কেমন কাল্‌চে মেরে গেছে, ঝলসে গেছে।

প্রান্তরের শূন্যতায় শাঁখের রোল কাঁপছে তখনো। অবাক হ'য়ে চেয়ে আছেন অবনীমোহন : তাঁর নির্বাচন এলাকা। মনে হয় যেন উনিশ শো বিয়াল্লিশের উন্মত্ত অগাস্টের দিনগুলো আবার ফিরে এলো হঠাৎ আজ সকালে। তাঁদের আন্দোলনের এ যেন শেষ প্রতিলিপিটি। নিঃশব্দ প্রতিরোধ নয়—এবার আঘাতও। গ্রামের চাষাভুসোরা উদ্দাম আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে থানার উপরে, পোস্ট অফিসে—প্রত্যেকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপরে। সব উৎখাত করে দিলে ক'দিনের জন্যে। জনপীড়নের বিপর্যস্ত ক্ষমতা ধীরে ধীরে আবার মাথা খাড়া করে উঠল একদিন। গ্রাম জ্বলল—দেশ জ্বলল। পুড়ল গ্রামের অসহায় কুটিরগুলি। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আবার আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে বনেজঙ্গলে।

শুধু বগার চরের অন্ধ হরিদাস এমনি এক আগুন-লাগা কুঁড়ের মধ্যে পথ হাতড়ে হাতড়ে মরে গেল সেদিন—দরজাটা খুঁজে পেল না। ঘরে ধোঁয়ার তাল, বাইরে ফৌজের উদ্যত সঙীন।

তারপর …

নৌকো চলেছে। জলের প্রবহমান ঘোলা স্রোত ছল্ ছল্ ক'রে উঠছে নৌকোর মাথায়। অমনি প্রবহমান কল্লোলের মতো অবনীমোহনের সংগ্রামী

জীবনের ঘটনা স্রোতও আজ কল্‌কল্ করে উঠছে। অবনীমোহনের দীর্ঘ জীবনের পুরাতন টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ঘটনাগুলো সব একত্রে জড়ো হ'য়েছে যেন অমলদের আজকের সংগ্রামে—ছড়িয়ে গেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। অবনীমোহন দেখছেন। ভাবছেন।

'দেখুন ডাকাত শালাদের আর এক কাণ্ড!' অগাধ নিস্তব্ধতার মাঝখানে দারোগার রুক্ষ কণ্ঠ চমকে দিল অবনীমোহনকে আবার।

আত্মস্থ অবনীমোহন—ফিরে দারোগার দিকে তাকালেন।

দারোগা একদিকে আঙুল দেখিয়ে ব'লল, 'ওই যে ওইখানে।'

গত দুর্ভিক্ষের চিহ্ন : মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় জড়ো করা রয়েছে মড়ার মাথা, হাড় কঙ্কাল।

দারোগা বলল, 'ওই সব কোথা থেকে খুঁজে পেতে এনে গ্রামসুদ্ধ লোক ডেকে ডেকে এনে দেখিয়েছে পিশাচরা মশায়! ওইসব ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে—ওই রকম ক'রে আর মরবে না। তারপর এই দেখুন—দিনে ডাকাতি—জবরদস্তি ক'রে মাঠের ফসল তুলে নিয়ে যাওয়া!'

অবনীমোহন তাঁর একটি সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সব ধান কি ওরা তুলে নিয়ে গেছে জ্ঞানশংকর?'

'না, প্রায় দুশো বিঘে পড়ে আছে এখনও। একটা লোক পাচ্ছিনে যে কেটে ঘরে তুলি। সব শালা একজোট হয়ে গেছে। কিন্তু একি ভাল? এই জেল-গারদ, গুলী-বন্দুকের মুখে খামাখা মাথা খারাপ ক'রে মরা! দেশ তো আজ স্বাধীন! যে যেমন—তেমনি থাক, শান্তিতে থাক। সেইটে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলবেন আপনি।'

'হ্যাঁ', দারোগা বলল। 'আরে দেশ তো স্বাধীন হ'য়ে গেছে! যত সব উদো মুখ্যু চাষার কাণ্ড। শালা ঘরের শত্রু বিভীষণরা ফ্যাকড়া বের করেছে দেখুন। গৃহবিবাদ—একি ভালো? জবরদস্তি ধান তুলে নিয়ে যাওয়া! মগের মুল্লুক! দেবো—একে একে কল্লু দেবো, ব্যাটারা ঠাণ্ডা না হ'লে। হ্যাঁ।'

রাজার হাট। নৌকো এসে গেছে। দলবল উঠলো ডাঙায়।

তিনটি আধাবয়সী কিসান মেয়ে দাঁড়িয়েছিল পথের পাশে—যেন এই দলটির জন্যেই অপেক্ষা ক'রছিল তারা। এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে বয়স্ক মেয়েটি অবনীমোহনের মুখের দিকে একবার চেয়ে নীরবে একটি চিঠি ও একটি কাগজের মোড়ক তুলে দিল হাতে।

চিঠিটা খুলতে সাহস হ'ল না অবনীমোহনের : হঠাৎ অমলের কথা

মনে পড়ে যায়। দারোগা তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে কড়া গলায় ব'ললো :

'এই —কি আছে ওতে ?'

'কি জানি।'

'জানিসনে ? দিল কে ?'

'জানিনি। অউ বাবুকে দিতে কইল।'

'বটে! দেখুন তো অবনীবাবু।'

কথায় কথায় দলটি চলেছে ধীরে ধীরে একটি ক্যাম্পের দিকে। পুলিসের অস্থায়ী ক্যাম্প। দলটি অনুসরণ ক'রে চলেছে কিসান মেয়ে তিনটি।

চলতে চলতে চিঠি পড়ছেন অবনীমোহন। মুখটা কঠিন হয়ে গেছে। চিঠিতে স্বাক্ষর নেই—কিন্তু হাতের লেখা দেখে হঠাৎ তাঁর হাতটা কেঁপে ওঠে একটু। অমলের লেখা :

"এ অঞ্চলের প্রাচীন এক জাতীয় সংগ্রামের নেতার কাছে আমাদের এক সহকর্মীর শেষ চিহ্ন পাঠালাম। কাল সে মারা গেছে। বুকে তার গুলী লেগেছিল। তার স্ত্রীকে আজ দিন তিনেক হ'লো পুলিস ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছে সওয়ালের জন্যে—তার খোঁজ নেবেন। আর আমাদের বিশ্বাস, একজন বিদ্রোহী কিসানের শেষ চিহ্নটুকু বহু সংগ্রামের সৈনিক একজন প্রাচীন জাতীয় নেতা নিশানের মতো করে ওড়াতে আজ ভয় পাবেন না।"

ক্যাম্পের কাছে এসে পড়েছে সবাই।

দারোগা ব'লল, 'কি চিঠি অবনীবাবু ?'

অবনীবাবু নীরবে শুধু মোড়কটা তুলে দিলেন দারোগার হাতে।

মোড়কটা খুলে দারোগা আঁৎকে উঠলো : 'একি মশায়! খুন! এ্যাঁ ?'

বুকে বাঁধা ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ কোন এক মৃত কিসানের—রক্তে যেন ছোপান। শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে।

অবনীমোহন কোন উত্তর দিলেন না। তিনি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে কি খুঁজছেন। তারপর হঠাৎ চোখ আটকে গেল তাঁর ক্যাম্পের পেছন—একটা গাছের তলায়।

গাছের সঙ্গে পেছনে হাত বাঁধা একটি মেয়ে—নগ্নপ্রায়, পরনে ছেঁড়া ময়লা একটা কাপড়। একটা গণ্ডারের মতো কুঁদো সেপাই সামনে থেকে সঙীন লক্ষ্য করছে মেয়েটির তলপেটের নিচে। বীভৎস এক হাসিতে ভরে উঠেছে সেপাইটার মুখ। মেয়েটি নিঃস্পন্দ—মাথাটা ঝুলে পড়েছে একদিকে। তিন দিনের বহু-নিপীড়িত, ক্লান্ত, ধর্ষিত একটি মুখ।

ভিড়ের ভেতর থেকে সেইদিকে হঠাৎ ছুটে গেলেন অবনীমোহন :

'এই থাম !—জানোয়ার !'

কয়েকজন সেপাই গিয়ে ধরে ফেলেছে অবনীমোহনকে।

হঠাৎ একটা হট্টগোল। মেয়েটি ক্লান্ত চোখ তুলে চেয়েছে। দুটো আশ্চর্য হয়ে যাওয়া চোখ।

দারোগা এগিয়ে এসে বলল, 'মাথা খারাপ করবেন না অবনীবাবু। আজ তিন দিন ওর কাছ থেকে একটা নাম বার করতে পারছিনা।'

'ছেড়ে দিন ওকে,' অবনীমোহন বুড়ো কম্পিত গলায় বললেন। 'ওর স্বামী মরে গেছে কাল।'

'মরে গেছে ! চিঠিটা কই দেখি।'

দারোগা এগিয়ে আসছে অবনীমোহনের দিকে। এগিয়ে আসছে। অমল কি ধরা পড়বে এবার—অমল ? ···অবনীমোহনের মুখটা পাণ্ডুর হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। হাতের মুঠোয় পাকানো চিঠিটা সকলের অলক্ষ্যে পায়ের তলায় ফেলে চেপে দাঁড়িয়েছেন তিনি। নিঃশব্দে তিনি চোখের ইসারা করলেন কিসান মেয়ে তিনটিকে—পালাক তারা, হয়তো ধরা পড়ে যাবে তাদের নেতা। অমল ···

মেয়ে তিনটি এগিয়ে এলো আরও কাছে—এক সঙ্গে। তাদের মধ্যে বয়স্ক মেয়েটি এসে অবনীমোহনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল আর পায়ের তলা থেকে পাকানো চিঠিটা নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

'কই চিঠিটা—'

'চিঠিটা কোথায় ফেলে দিয়েছি—এইখানে কোথায়—মানে—' অবনী-মোহন কম্পিত কণ্ঠে ব'ললেন। চারপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলেন সভয়ে।

'ফেলে দিলেন ? এই দ্যাখ পকেট।'

দারোগার ধারাল চোখের ইসারায় মুহূর্তে দুজন সেপাই এগিয়ে এসে খানাতল্লাস ক'রতে লাগল স্বয়ং অবনীমোহনের কাপড়-জামা।

'একী ! কি হচ্ছে এটা !' অবনীমোহন চিৎকার করে উঠলেন।

দারোগার চোখ পাথর। সেপাইরা খানাতল্লাস করছে। কিন্তু কোথাও নেই চিঠি। দারোগা ঘুরে দাঁড়াল তিনটি কিসান মেয়ের দিকে। তারা তখন ভিড় ছেড়ে সরে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে।

দারোগা পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠল ঃ

'এই পাকড়ো হারামজাদীদের। —লে যা উধার, সওয়াল কর। চিঠি চাই—আমার চিঠি চাই।'

সেই গাছ—সেই কুৎসিৎ গাছটা ··· তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

কাঁপছেন অবনীমোহন ঃ বুড়ো হয়ে গেছেন—বহুদিন ধরে বুড়ো হ'য়ে গেছেন তিনি। নিজের ওপরে তাঁর রাগ হয় হঠাৎ ঃ কিছুই করবার নেই যেন তাঁর ঠিক এই মুহূর্তে।

পুলিসের দু-জোড়া শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে শুধু তিনি ছটফট ক'রতে লাগলেন।

গ্রামনগর ॥ ১৯৫০

বেটা

গাড়ী আসবার কয়েক মিনিট আগে স্টেশনটা জম্‌জমাট। মুসাফিরখানা আর প্লাটফর্মে প্যাসেঞ্জারের ভীড়। তার মধ্যে আছে ব্যবসায়ী, ফড়ে, ভদ্রলোক, অফিসার, দেহাতী মানুষ। মুসাফিরখানার এক কোণায় মুচি ধরিছনের সামনে কয়েকজোড়া ছেঁড়া জুতো। কোনটায় পেরেক বসবে, কোনোটা সেলাই মেরামতীর কাজ। আধবুড়ো লোকটা একভাবে মাথা নিচু ক'রে কাজ ক'রে যায়। গাড়ী আসবার সময় যতো ঘনিয়ে আসে ততোই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে প্যাসেঞ্জাররা। তাগাদা বাড়ে। ধরিছনের নিপুণ হাত চলে ততো দ্রুত। সেলাই মেরামত সে নিজে করে। পালিসের কাজ থাকলে হাঁক দেয়ঃ

'ফ্যালা!'

ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা বছর আষ্টেকের গোরাপানা ফুটফুটে ছেলেটা ছুটে আসে সামনে, মাথা ভর্তি কটা কটা চুল। ধুলোকাদায় মলিন মুখে চাপা ঠোঁট দুটো লাল টুকটুক করছে। বললে, 'কি করতে হবে চাচা!'

ধরিছন কাজ করতে করতে মুখ না তুলেই বলে, 'পালিস।'

ফ্যালা লেগে যায় জুতো পালিসে।

তারপর গাড়ী এসে দাঁড়ালে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। সেই ভীড়ের ভেতর থেকে হাঁক আসে আবারঃ

'ফ্যালা!'

'চাচা!' ফ্যালা ছোটে হাঁক লক্ষ্য ক'রে।

নীল কোর্তা-পরা ঘণ্টি-ম্যান চৈতন্য গম্ভীর চাপা গলায় বলে, 'মোট আছে বাবুর। আগলে দাঁড়া—ভাগুচাচা আসছে।'

ভাগু তখন হয়তো গাড়ীতে অন্য কাবুর মোট তুলতে ব্যস্ত। গাড়ী থেকে নামল যারা তাদের মোট থাকলে পাহারা দেয় ফ্যালা আর চৈতন্য। ভাগু এসে সেগুলো একে একে তুলবে মোটর বাসে।

দেহাতী মানুষের হাঁক, মোটরের হর্ন, গোরুরগাড়ীর গাড়োয়ানদের দর কষাকষি—সবটা মিলে একটা জড়ানো হাল্লা। এর মধ্যে তারির করুণ কণ্ঠ কাৎরাতে থাকে মুসাফির খানা থেকে ট্রেনের জানলায় জানালায় :

'অনাথা গো বাবু—মোর জমিন, গোরু, আপনজন সব কুথায় গেল গো বাবু ··· চাষী গিরস্তের বৌ গো বাবু ···'

মাত্র কয়েক মিনিটের দুরন্তগতি হাল্লা। তারপর গাড়ী চলে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলেনী ইস্‌টিশান তার চারদিকের হা-হা করা পোড়া প্রান্তরের শামিল। মালপত্রের আমদানী-রফতানী, জনসমাগম—সব আছে, সবটা তরল চঞ্চল অস্থায়ী। স্থায়ী শুধু বেলেনী ইস্‌টিশানের সাড়ে চারটে মানুষ—বালক ফ্যালা, তিনটে পুরুষ আর একটা মেয়েলোক তারি।

গাড়ী চলে গেলে সবাই বেকার। সাড়ে চারটে মানুষ জটলা করে মুচি ধরিছনের ছেঁড়া চামড়ার ঝুলির সামনে। অপেক্ষা করে আবার একটি গাড়ীর।

সেদিন বিকেলের গাড়ী চলে যাওয়ার পর যখন স্টেশন খালি হয়ে গেল তখনও ধরিছনকে দেখা যায়—একভাবে মুখ নিচু ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

চৈতন্য হেসে বলল, 'ইস্—আজ মিস্তিরির বহুৎ কাম মালুম হচ্ছে ?—'

ধরিছন কাজ করতে করতে জবাব দিলে, 'একঠো গাঁওলি দালাল—শহরে গেছে, শালা দিয়ে গেছে শুধু দু-পাটি শুকতল্লা। দেখো। ই মেরামত করতে হবে। ফিরে এসে লেবে।'

'তো আজ বহুৎ মুনাফা মিস্তিরি।'

'গাঁওলি দালাল পয়সা দিবে জাদা ? হায় হে কোম্পানী !'

চৈতন্যকে ডাকে সবাই কোম্পানী ব'লে—বোধ হয় সে রেল কোম্পানীর কাজ করে, তাই।

এমন সময় ভাগুরাম এসে দাঁড়াল। গায়ে বেঢপ ঝুল একটা লম্বা কোট —বোধ হয় কবে কোন স্টেশন মাস্টারের দেওয়া। কালি ময়লা ঝুল হয়ে গেছে কোটটা—ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে এখানে ওখানে। পরনে হাফপ্যাণ্ট —কিন্তু সেটা এই বেঢপ-ঝুল কোটের অন্তরালে কোথায় যে ঢাকা পড়ে গেছে, লোকটাকে হঠাৎ দেখে মনে হয় ল্যাংটো। ওর সমস্ত চেহারায় একটা খ্যাপাটে বেপরোয়া ভাব মেশানো—আধবুড়ো চৈতন্য ও ধরিছনের চেয়ে বয়সও ওর কম। যৌবনের শেষ জেল্লা এখনও ওর চোখে মুখে লেগে আছে। সে এসে পাশ ঘেঁষে বসল তারির। তারি একটা গালাগাল দিয়ে সরে বসল একটু। চৈতন্য হাসল।

'মুয়ে আগুন।' তারি ফোঁস্ ক'রে উঠল, 'একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ছে দ্যাকো না!'

ভাগু বললে, 'আহা, গোসা হৈল তারি।'

'আহা রে, মুখ পোড়াকে সোহাগ ঢেলে দেবে গ'।'

গোধূলির প্রান্তর পার হয়ে তখন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে একটু একটু ক'রে। এখন ওদের সারা দিনের উপার্জন ভাগাভাগির সময়। চৈতন্য বাজে মস্করা জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে বললে, 'ছোড় দোস্ত—কে কত কামালে বলো।'

ভাগু একটা সিকি ধরে দিয়ে বলল, 'লাও কোম্পানী—মোর ষোলো মোট। ষোলো পইসা—এক সিকি, বাস্।'

চৈতন্য গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'উঁহু'—বিশ মোট।'

'তুমি গিন্‌তি করেছে?'

'তবে ঝুট বলছি?'

ভাগু হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে বলল, 'পরখ করছিলাম—কোম্পানী ঠিক ঠিক গিন্‌তি করে কিনা।'

'তোম শালা বহুৎ চিটিংবাজ হ্যায়। রোজ গোলমাল করবে। আমি দুসরা কুলি ঠিক করব। কত লোক পায়ে ধরছে। তবু তোর জন্যে তাদের আমি ভিড়তে দিই না!'

ভাগু আরও একটা আনি ধরে দিয়ে বললে, 'লাও কোম্পানী। মাফ কিজিয়ে।' বলেই চৈতন্যের একটা পা চেপে ধরলে ঝপ্ ক'রে।

ধরিছনও একটি সিকি ধরে দিয়ে ক্লান্ত বিষণ্ন গলায় বললে, 'মোর ষোল জোড়া হয়েছে কোম্পানী। দালালের জুতির দাম পাইনি—বাকী রইল। শালার সন্ধ্যের মোটর আসবার সময় হল—তো মোর কাম শেষ হল নি। চোখেই দেখতে পাচ্ছি না।'

জুতোতে জোড়া-প্রতি এক পয়সা, মোট প্রতিও এক পয়সা—চালাও রেটের দালালি। চৈতন্যের উপরি রোজগার।

চৈতন্য বললে, 'আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।—বাস আসবার সময়ও হলো মিস্তিরি—জলদি হাত চালাও।'

চৈতন্য মুসাফিরখানার আলো জ্বালবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

ভাগুরাম বললে, 'পালিস-টালিস থাকলে দাও মিস্তিরি—করে দিই।'

একপাটি মেরামতী জুতো এগিয়ে দিয়ে ধরিছন বললে, 'করো ভেইয়া। শালা এসে পড়লে চিল্লাবে।'

ভাগু জুতো পালিস করতে লাগল।

একপাশে বসে আছে তারি, হয়তো আর একটি গাড়ী আসবার অপেক্ষা করছে। তার উপার্জনের শুধু কোনো দালালি কমিশন নেই। চৈতন্য রেহাই দিয়েছে তাকে—অন্য কোনো ভিখিরীকে সে ভিড়তেও দেয় না স্টেশনের ভেতরে। তারি বসে আছে দূরের ডিসটেণ্ট সিগন্যালের দিকে চেয়ে—একটা পাতলা অন্ধকারের পর্দা তাকে ঘিরে ঘন ঘনতর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে—একটি নারীদেহের রহস্যময়তা গভীর হচ্ছে ক্রমশ। হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে—এখন বোঝা যাচ্ছে না বয়স তার বাইশ, বত্রিশ না বিয়াল্লিশ। বাঙালী মেয়ের আপাদমস্তক শাড়ী পরার ঢঙে কড়া আলোতেও অবিশ্যি বয়স ধরা মুস্কিল।

ভাগু জুতো পালিস করতে করতে আড়চোখে কয়েকবার দেখল। তারিকে ডাকল, 'শুনো—এ তারি!'

তারি একভাবে বসে রইল—ঘুরেও তাকাল না।

ফের বললে ভাগু, 'আহা—গোসা হৈল।'

তারও কোনো সাড়া এল না।

ভাগু গলা নামিয়ে ধরিছনকে বললে, 'আজ বিলাতী খাবে মিস্তিরি?'

'বিলাতী?'

'হাঁ, আজ বহুৎ খুশ খবর মিস্তিরি। ফিন্ লড়াই লাগ গিয়া।'

বাবু ভায়াদের আলোচনা থেকে সংগৃহীত খবর—মহাযুদ্ধের আগুন নিভে নিভেও নেভে না—আবার স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছে কোথায় একটা শিখা। শোনা তক্ ভাগুরাম উত্তেজিত। আবার জমে যাবে মরা এই বেলেনী ইস্‌টিশান!—

'অব্ লাল বন যাও মিস্তিরি—ফুর্তি করো।' ভাগুরাম তুড়ি দিয়ে উঠল।

এমন সময় চৈতন্য আলো জ্বালতে এল।

ভাগু বললে, 'কি মিস্তিরি, খাবে?'

ধরিছন বললে, 'কোম্পানীকে বল।'

'কোম্পানী, খাবে আজ বিলাতী? তো বল—চলে যাই জংশন ইস্‌টিশানে এই গাড়ীতে?' ভাগু পুরো খুশ-খবরটা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল চৈতন্যের জবাবের জন্য।

চৈতন্য আলো জ্বালতে জ্বালতে বললে, 'যা চলে—বহুদিন বিলাতী খাইনি।'

'বাস।' ভাগ্নু হঠাৎ একটা ডিগবাজী খেয়ে বললে, 'কোম্পানীকা হুকুম হো গিয়া।' তারপর হঠাৎ বোধ হয় তার তারির কথা মনে পড়ে গেল। তারির পেছনে গিয়ে ফের বললে,' 'ওহ্ হো—তারি বহুৎ গোসা হৈল।'—

চৈতন্য হাসতে হাসতে বললে, 'তুই শালা ওর পেছনে বড্ড লাগিস। জুতোর পালিসটা করে দিবি তো দে—বাস এসে পড়বে এখুনি।'

ভাগ্নু ফের পালিস নিয়ে বসলো।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো ফ্যালা। আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারি তাকে চোখের ইসারা ক'রে ডেকে নিল কাছে—কি যেন বলল ফিস্ ফিস্ ক'রে। পরে-পরেই ফেলা এসে দাঁড়াল ধরিছনের সামনে—যেখানে তিনটি পুরুষ বসেছে জটলা ক'রে!

ফ্যালা বললে, 'সবাই মোর পয়সা দিয়ে দাও চাচা।'

চৈতন্য বললে, 'বাস—মোদের মহাজন এসে গেল, পয়সা দিয়ে দাও হে সব।' বলে নীল কোর্তার পকেট থেকে একটা দু-আনি বার করে দিলে, 'লাও মহাজন।'

ধরিছন সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে তুলতে বললে, 'আমি তো আজ ওকে পয়সা দিবো না। তখন বললাম, দে পালিসটা করে—তো ও ছুটে চলে গেল। বললাম ওকে, কাম শিখে লে বেটা।'—

ফ্যালা বললে, 'শিখবো চাচা—ঠিক শিখবো কাল থেকে। এখন মোর পয়সা দিয়ে দে। না হলে এখুনি তোরা সব মদ খেয়ে খরচা করে ফেলবি।'

'আরিব্বাপ।' ধরিছন হাসতে হাসতে একটি দু-আনি পকেট হাতড়ে বের করে দিয়ে বললে, 'বহুৎ হুঁসিয়ার মহাজন আছে! লে বেটা লে— তোর পইসা।'

ভাগ্নু কিন্তু মুখ গোমড়া করে এক ভাবে জুতো পালিশ ক'রে যাচ্ছে। ফ্যালা তার দিকে চেয়ে বললে, 'চাচা—তোমার পয়সা?'—

ভাগ্নু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'শালা সাতজন্মের ভাইপো হামার রে! যা ভাগ— আজ এক পয়সা দিবো না।'

'বাঃ, আমার পয়সা! রোজ দাও—আজ দেবে না কেন?' ফ্যালার সুর আব্দারের।

'ভাগ শালা। আট বচ্ছর তো দিলাম—আবার কি!' ভাগ্নু দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।

'আর সব চাচারা যে দিলে!'—

'দিলে তো দিলে। আমি আর দিবো না।' ভাগু তেরিয়া হয়ে জবাব দিল।

ফ্যালা মার খাওয়া মুখে চেয়ে রইল ভাগুর দিকে কিছুক্ষণ। তারপর তাকাল চৈতন্যের দিকে—যেন বিচারের আশায়। ধরিছন একমনে ফোঁড় তুলছে মুখ নিচু ক'রে।

কেউ আর কোন কথা বলে না। ভাগু ক্ষেপলে পয়সা দেবে না—এ ধরিছনও জানে, চৈতন্যও জানে। লোকটা হঠাৎ মাঝে মাঝে তেরিয়া হয়ে ওঠে এই রকম। গোঁয়ার আছে—বয়সের গোঁ। তবু আট বছরের প্রতিটা দিনই সে এই ক্ষুদে মহাজনের চাঁদা জুগিয়েছে—দিনের রোজগার থেকে দিয়েছে তিন জনেই সেই সেদিন থেকে, আট বছর আগে যেদিন একটি শিশু জন্মেছিল মুসাফিরখানার এক কোণে।

তখন বেলেনী স্টেশন ছিল জমজমাট। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের সুরুতে। কাছাকাছি হয়েছিল হাওয়াই ঘাঁটি, সেনাবারিক। ক্ষুধার্ত বিপর্যস্ত গ্রাম-জীবন ভেঙে ভীড় করে এসেছিল নানান জাতের নরনারী। তারপর যুদ্ধের সে তরঙ্গ সরে গেল একদিন, প্রায় পড়ো প্রান্তরের শামিল হয়ে গেল আবার বেলেনী স্টেশন। আর তাতে তরঙ্গবাহিত জঞ্জালের মতো ঠেকে থেকে গেল এই কটা লোক। তাদের মধ্যে বেঁচে উঠেছিল একটি শিশু। সে আজ বড় হয়েছে। ধরিছনের কাজ ক'রে দেয়—একা ভাগুরাম যখন সকলের মোট আগলাতে পারে না তখন সে পাহারা দিয়ে সাহায্য করে।

ফ্যালা ভাগুরামের দিকে তাকিয়েছিল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। ভাগু ফের একবার ঝাঁকরে উঠল, 'এবার নিজে মোট বয়ে রোজগার করবি—হাঁ। ভাগ শালা।'

ফ্যালা চম্‌কে উঠে দু-পা পেছিয়ে গেল। তাকালো পিট পিট ক'রে। চোখে এবার তার শয়তানী খেলছে। ফট্ ক'রে বলে বসল, 'মোট বইবো কেন? উ তো বেইজ্জতী কাম। মোকে রেলের কাম শিখাবে বলেছে কোম্পানী চাচা।'

হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো ভাগুরাম। তেড়ে গেল, 'কেয়া! বেইজ্জতী কাম! তবে রে শালা।—'

ফ্যালা গিয়ে লুকাল একেবারে তারির কোলের মধ্যে। ধরিছন আর চৈতন্য হেসে উঠল। ভাগু আবার জুতো পালিশ করতে লাগল।

তারি খ্যান-খ্যান ক'রে গাল পাড়তে লাগল, 'মোট বয়ে মরুক যার জমিন ঘর-দোর নাই, বলদ-গোরু নাই—হায়রে পোড়া কপাল যার। মোট

বয়ে বয়ে মরুক যার গাছতলায় ডেরা—কপালে হা-অন্ন। মোট বয়ে মরুক যার'—

তারি বকর বকর ক'রে চলল এক ভাবে।

ভাগু ফের বলে উঠল, 'আহ্‌হা গোসা হৈল জমিন-ঘর-বলদকা রানী।'—

হাসে চৈতন্য আর ধরিছন।

তারি ঝাম্‌টা দিয়ে বলল, 'ছিল তো রে উনুন মুখো, তোর মুয়ে আগুন।'

ভাগু শুধু বললে, 'হাঁ—ছিল। জরুর ছিল জমিন-ঘর-বলদকা রানী।'

ছিল। সে অতীতের কথা—আট বছর আগের কথা। তারিই সে কথা তোলে কখন কখন, চাষী-বউয়ের মান ইজ্জতের কথা। ওরা হাসে। কাজের মধ্যে ওদের মান-মর্যাদার বালাই নেই। পরস্পরকে ওরা সাহায্য করে। এমনি করে আট বছর কেটে গেছে। কে কোথা থেকে এসেছিল, কেমন ক'রে ঠেকে গেল এখানে—সে কথা সারা দিনের জুতো সেলাই, মোট বওয়া আর ঘণ্টি দেওয়ার মধ্যে মনেও পড়ে না কারুর। শুধু সন্ধ্যের পর শেষ ট্রেন ছেড়ে গেলে তাড়ি বা মদ খায় তিন জনে, তারপর মাতলামী সুরু করে ভাগু। সারাদিন মোট বয়, ধরিছনের জুতো মেরামতের কাজেও সাহায্য করে। কিন্তু পেটে মদ পড়লেই খামাখা ধমকাতে শুরু করে সে—বিশেষ করে ধরিছনকে ঃ

'হাম বাহ্মণ হ্যায়—বাহ্মণ! বড়া জাত! আর তোম?—চামার।'

ধরিছন তখনও খুব বিনীত—হাতজোড় করে বসে থাকে ভাগুর আস্ফালনের সামনে। আর চৈতন্য বলে তার ঘর-সংসারের কথা। কোথায় পড়ে আছে সব! ছেড়ে দেবে ই কাম, ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে সে কোনো একদিন দেশে; জীবন বড় ফাঁকা লাগে। শুনতে শুনতে আধবুড়ো ধরিছন ফোঁপাতে সুরু করে ঃ

'কোই নেই হ্যায়—হামারা কোই নেই হ্যায় ভেইয়া। জরু মর গেয়া—বহুড়ী ভাগ গেয়া—লেড়কা খতম হো গেয়া লড়াই মে। হামারা কোই নেহি।'—

অন্ধকারে, মাতলামিতে হঠাৎ কবেকার পুরানো জীবন যেন প্রাণ পায় ওদের। ফ্যালা হেসে গড়াগড়ি যায়। মদ খেতে বসে ফ্যালাকে দেয় ওরা তেলেভাজার চাটের ভাগ। কোনো দিন চৈতন্য ফ্যালাকে কোলে ক'রে বক বক করে—ফ্যালাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তু হামার লেড়কা।'

আর ভাগু চিৎপাত হয়ে বিড় বিড় করে, 'তারি পিয়ারী!'

তারি ঝামটা দিয়ে ওঠে হয়তো, 'মুয়ে নুড়ো জ্বেলে দেবো মুখপোড়া ?'

'আহ্হা—তারি গোসা হৈল।' ভাগুরাম গোঙিয়ে গোঙিয়ে বলে, "হামার ভি জমিন গোরু বলদ ছিল তারি, যজমান ছিল – সব খতম।'

'চুবো মুখপোড়া !'

এই অনড় আবর্জনার মত সাড়ে চারটে জীবের জীবনে একদিন পরিবর্তন এল। স্টেশন-মাস্টারকে ধরে ভাগু গ্যাং-এর একটা নোকরি জোগাড় ক'রে ফেললে! মাইল দশেক দূরে কোন এক স্টেশন থেকে ডবল লাইন পাতা হচ্ছে—বিস্তর কুলির দরকার! ভাগুর কাজ হয়ে গেল।

'রাম রাম কোম্পানী, রাম রাম মিস্তিরি।' ভাগুরাম বিদায় নিয়ে দাঁড়াল একদিন প্লাটফর্মে—পেছনে তারি।

হাসি মুখে চৈতন্য এবং ধরিছন বিদায় দিল বটে কিন্তু মুস্কিল হল ফ্যালাকে নিয়ে। সে যত ঝাঁপিয়ে পড়ে তারির আঁচল চেপে ধরতে যায়, ভাগু ততো তেড়ে যায়ঃ

'মারে ঝাপট—ভাগ শালা।'

তারিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাগুরাম। ওদের শলা পরামর্শ ক'রে কখন মিল হয়ে গেছে। ফ্যালা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকেঃ

'মাকে লিয়ে যাবে কেন! মোর মাকে'—

'শালার সাতজন্মের মা! ভাগ।'—ভাগু রুখে ছুটে গেল।

ফ্যালাও ক্ষেপে গেছে। কাঁকর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল ভাগুর দিকে। টাঁই ক'রে লাগল একটা ভাগুর কপালে। ভাগু ছুটে গেল ফ্যালার দিকে। বালক কিন্তু ভয় পেল না। ভাগু তার গলা চেপে ধরতে যেতেই ভাগুর হাতে কামড়ে দিল ফ্যালা। বাচ্চাটা প্রাণপণ লড়াই করছে আত্মরক্ষার জন্যে—বার বার ছুটে যেতে চাইছে তারির দিকে। তারপর হঠাৎ একটা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে দূরে। শেষ পর্যন্ত তাকে আটকে রাখল চৈতন্য আর ধরিছন। রেল-গাড়ীতে উঠল ভাগুরাম। পেছনে ফিরে দেখল, তারি দাঁড়িয়ে আছে কেমন বোকার মত। ভাগু ডাকলঃ

'গাড়ী ছেড়ে দিবে—এ তারি!'

'এ্যাঁ!' কেমন হকচকানো ভাবে তাকাল তারি চারদিকে। এতদিন পরে একটা নতুন অবস্থা তাকে যেন নির্বোধ ক'রে দিয়েছে হঠাৎ।

'উঠে আয় জলদি।'

তারি থমথমে মুখে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

আপ-এর গাড়ী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাউনের গাড়ী এসে হাজির। যাত্রীর হৈ-হাল্লা—জুতোর মেরামতী কাজ, ওদিকে লাইন ক্লিয়ার—ঘণ্টি, এ সবের মধ্যে ধরিছন আর চৈতন্য নাজেহাল। তাদের আর খেয়াল রইল না—ফ্যালা কোথায় গেল। এ গাড়ীও যখন চলে গেল এবং সারা প্লাটফর্ম মুসাফিরখানা খালি হয়ে গেল তখন ফ্যালাকে তার মধ্যে দেখা গেল না কোথাও। আজ আবার একজোড়া ছেঁড়া জুতো সারাতে দিয়ে গেছে কে—ধরিছন তাই সেলাই করছে। চৈতন্য তার সামনের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে নীরবে বিড়ি ফুঁকছে।

সূর্য তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। সামনে গোধূলি। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের সামনে ইঁদারা। তার বাঁধানো উঁচুপাড়ের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে বসে আছে ফ্যালা। ওর চোখে মুখে অভিমান জমাট বেঁধে আছে। হাঁক শুনেছে সে :

'ফ্যালা !'—চৈতন্যের ডাক।

'এ মহাজন !'—ধরিছনের ডাক।

ফ্যালা সাড়া দেয়নি। হাঁ-ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখেছে দূরে—দক্ষিণে : বড় সড়ক ধরে বহু দূরে ধান কলের চোঙ পার হয়ে যেতে যেতে—বাঁ দিকে আরও অনেক দূরে এক গাঁয়ে উঁচু উঁচু যে নারকেল গাছ, সেইখানে তাদের পানাদহ গ্রাম না ?—ঘর-দুয়ার গোরু জমিন ধানের গোলা ! এই বারোয়ারী মুসাফিরখানার এক কোণায় মায়ের কোল ঘেঁষে বসে কতদিন শুনেছে সে এ গল্প। হ্যাঁ—সেখানে সে গিয়ে বলবে, মা মরে গেছে।···

সারা বিকেল পাত্তা নেই ফ্যালার—ইঁদারার উঁচু পাড়ের আড়ালে সে লুকিয়ে রইল।

তার জন্যে গভীর উদ্বেগও ছিল না কিছু ধরিছন বা চৈতন্যের। এ লাইনে এই রকমই হয়—কাঁদে বাচ্চাগুলো কদিন। বাস্—তারপর ভুলে যায় সব।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে ধরিছন আর চৈতন্য গেছল তাড়ি খেতে। ধান-কলের কাছে তাড়ির দোকান। তাড়ি খেয়ে ফেরবার মুখে সড়কের ওপরে দেখা ফ্যালার সঙ্গে।

'আহ্ রে মহাজন !' ধরিছন ধরে ফেললে ফ্যালাকে, 'কাঁহা যাবি বেটা ?'

ফ্যালা ফুঁপিয়ে উঠল, 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোকে।'

চৈতন্য তার আর একটা হাত ধরল। বললে, 'কোথা যাবি বে—ই অন্ধকারে—একলা !—এঁ্যা ?'

'পানাদহ—মোদের গাঁ।' ফ্যালা ফুঁপিয়ে জবাব দিল।

'হাঁ হাঁ—তোদের গাঁ!' ধরিছন হেসে বললে, 'কে বলল তোকে সে কথা?'

'কেন—মার মুখে শুনেছি কত দিন।'

কতদিন শুনেছে সে গাঁয়ের কথা—সে গাঁ যেন চোখের সামনে ভাসছে। পা ছড়িয়ে তাকে কোলে বসিয়ে ঘুমোবার আগে কতদিন সেই গল্প করেছে তার মা।

চৈতন্য যেন রসিকতা করে বললে, 'তা তোর মা-টা কে বটে?'

ফ্যালা হাত ঝাঁকি দিয়ে বললে শুধু, 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোকে। আমি চলে যাব।'

'আরে বেটা!' ধরিছন বললে, 'কে তোর মা—কোথায় তার গাঁ রে মহাজন, কুছু জানিনা। হাঁ বটে—মোরা তোকে মানুষ করেছি।'

চৈতন্য বললে ওর হাতে মৃদু টান দিয়ে, 'চল বেটা চল।'

'কুথায় যাবি বেটা ই অন্ধকারে—পথ ভুল ক'রে কোথা ঘুরবি তার ঠিক নাই।' ধরিছন ওর আর একটা হাত ধরে এগোল।

বালকের ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত মানসে আবার একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। ফোঁপাতে থাকে সে। কি কথা বলে এরা? ছোট পরিসর তার চেনা জগৎটা পলকে পলকে যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সেই ঝাপসা ফাঁকা পথ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে এল সে মুসাফিরখানায়!

তার শোবার ছোট চটখানি পাতা হল আবার ধরিছনের চট ঘেঁষে আজ। ধরিছন তাকে জোর ক'রে শুইয়ে দিয়ে বললে, 'ঘুম কর বেটা—ঘুম কর।'

মুসাফিরখানাটা আজ অনেক বেশী বড় আর ফাঁকা মনে হয় ধরিছনের কাছেই। তারি নেই। ভাগ্ন নেই। তার কোলের কাছ ঘেঁষে ফোঁপাচ্ছে শুধু বাচ্চাটা। একটানা সেই ফোঁপানী শুনতে শুনতে সারা দিনের ক্লান্তির পাহাড় নেমে এলো তার চোখের ওপরে।

ভোরের পাঁচ নম্বর ডাউন ট্রেন প্লাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে সিটি দিচ্ছে ঘন ঘন। স্টেশন মাস্টার ছুটে বেরিয়ে এল, চৈতন্য ছুটে গেল। ঘুম ভেঙে গেল ধরিছনের। চমকে উঠে বসে দেখল সে—ফ্যালার চট খালি। ধরিছন চোখ মুছতে মুছতে উঁকি মারল রেল-লাইনের দিকে। সেখানে তখন একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেছে।

এ্যাকসিডেন্ট।

এ্যাংলো ড্রাইভার স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করল, 'এ লাইনে শেষ গাড়ী গেছে কখন ?'

'রাত চারটে—মালগাড়ী, গুডস ট্রেন।'

এ্যাকসিডেন্ট শেষ রাতের দিকেই হয়ে গেছে। রক্ত-প্রবাহ তখনও তাজা —সজল। ধরিছনের কোলের কাছ থেকে কখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে পালিয়েছিল ফ্যালা, মন্থরগতি মালগাড়ীর বগীতে চড়ে যেতে চেয়েছিল তার আজন্ম চেনা সেই মায়ের কাছে।

রেল-লাইন ধরে হেঁটে হেঁটে সেই ভীড়ের পেছনে এমন সময় এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে—চোখে মুখে তার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসার ক্লান্তি। ভীড়ের মধ্যে পাংশু মুখে সে একবার উঁকি মেরে দেখল—তারপর আর্তনাদ ক'রে উঠল ঃ

'ওরে ফ্যালারে—আমি যে তোর জন্যে পালিয়ে এলম রে ?'—

এ্যাংলো ড্রাইভার স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করল, 'ও কে—মা ?'

'হ্যাঁ। ভিখারী।'

চৈতন্যের ঠোঁট কাঁপছে। বললে, 'না হুজুর—ওর মা মরে গেছে আট বছর আগে। সেই যুদ্ধের সময়ে।'

ধরিছন তখন ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝুঁকে হাত বুলোচ্ছে ফ্যালার কাটা ধড়টায়, 'বেটা ··· বেটা!'

'ই কোন হ্যায়—বাপ ?' এ্যাংলো ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

স্টেশন মাস্টার বলল, 'হবে স্যার—এদের মধ্যে হবে কেউ একটা।'

চৈতন্য আবার প্রতিবাদ ক'রে উঠল, 'না হুজুর—ওর বাপ্ ছিল একটা সাহেব মিলিটারী।'

'তব তোম লোগ রোতা কাহে ?'—

রোতা কাহে—কেন কাঁদে ? মানুষগুলো কাঁদে কেন! কেউ উত্তর দিলে না। বোবা পশুর মতো গোঙিয়ে মরছে তারিও, ধরিছন আর চৈতন্যের চোখে জল।

নামগোত্রহীন একটা দেহ নিয়ে কান্না—এ্যাংলো ড্রাইভার ধমক দিলে ঃ

'জল্‌দি সাফ কর লাইন।'—

চৈতন্য আর ধরিছন বেওয়ারিশ কাটা বাচ্চা ধড়টাকে সরিয়ে নিল লাইনের ওপর থেকে সযত্নে—সস্নেহে।

গাড়ী চলে গেল।

দীর্ঘ আট বছরের মধ্যে একটি নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটে গেল সেদিন সন্ধ্যের পরে বেলেনী স্টেশনের মুসাফিরখানায়। পোড়ো প্রান্তরের দিক-চিহ্নহীন গাঢ় অন্ধকারে জমাট বেঁধে গেল সেদিন স্তব্ধ বেলেনী স্টেশন। এতটুকু সাড়াশব্দ নেই কোথাও—নেই মাতলামীও। ওরা আজ কেউ মদ ছোঁয়নি। মেজাজ নাকি আজ ওদের খারাপ। তারির চটটা পাতা হয়েছে আবার এক কোণায়। তার কোল ঘেঁষে পাতা হয়নি শুধু আর একটা ছোট চট। সেটা গুটানো।

ঘরের ঠিকানা ॥ ১৯৫৩

কাচ্চাবাচ্চা মেয়ে-মরদ করে জনা বারো হবে। শড়কের ধারে গাছের ছায়ায় বসে পান্তা ভাত খেয়ে উঠল আবার বোঁচকা-বুঁচকি হাঁড়ি-কলসী নিয়ে। চলল পুবমুখো।

'কুথাকে যাও বটে গো ?' ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ী থেকে জিজ্ঞেস করল হট্‌লগর মাঝি।

জবাব এল, 'খড়্গপুর।'

'হাত্তোর খড়্গপুর ··· খড়্গপুর !' হঠাৎ ক্ষেপে যায় হট্‌লগর। পিটোতে থাকে গাড়ীর গোরু দুটোকে। এলোপাথাড়ি। খড়্গপুর নামটা শুনলেই আজকাল ক্ষেপে যায় সে। দলকে দল—দিনের পর দিন—সব চলল বনবাদাড় গ্রাম-ঘর ভেঙে মেয়ে মরদ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সেই কোন জাত খোয়ানোর বাজারে—ইজ্জত বেচার কারখানায়। যাক চুলোয়! শয়তান ওদের পেছু নিয়েছে নির্ঘাৎ।

সকৌতূহলে শুধোয় তবু সে, 'কুথা থেকে এলেক বটে ?'

'পাথরডাঙা গো !' জবাবের সঙ্গে ক্লান্ত বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস মেশানো।

কোথায় সে পাথরডাঙি লাল মাটির দেশ! আরও পশ্চিমে!

তবু তো গ্রাম-দেশ। তার জন্যে হট্‌লগরের অদ্ভুত এক মমতা ঃ পূর্ব-পুরুষের গ্রাম, হাতে তৈরী পাথরডাঙা জমি, জাতের মানুষ—সব ছেড়ে চলল কি-না ওরা অজাতের দেশে! হট্‌লগর গর্‌গর্‌ করে ক্ষেপে পায়ের গুঁতো মারে গোরু দুটোকে। বললে, 'তো সব ছেড়ে চললে তুমরা! যাও ক্যানে ?'

'যাই ক্যানে ?'

নেংটি-আঁটা চওড়া-কাঁধ যে আধবুড়ো লোকটা কথা কইছিল হট্‌লগরের সঙ্গে, সে তাকাল এবার চোখে চোখে—ক্ষোভে, ক্রোধে। খোঁচা লেগেছে যেন। বলল ঃ

'তোর ঘর কুথা হে ? জানিস তুই, মোদের মেয়াগুলার ইজ্জৎ কেড়ে

লিলেক, ঘর জ্বালাই দিলেক, তিনটো মরদ খুন হয়ে গেল বন্দুকের গুলীতে !' লোকটা গর্‌গর্‌ করে উঠল খোঁচা-খাওয়া বুনো বেড়ালের মতো, 'আর মোরা—মোরা জঙ্গল সাফ করলম, পাথর ভাঙলম, জমিন করলম, চাষ করলম। আর বাস্‌ ! সিংজী বলে দিলেক কি না—জমিন তোদের লয়, পালা ! জঙ্গলেও ঢুকতে দিলেক না, কাঠও কাটতে দিলেক না !'

'বটা—বটা—বটা !'—

মুখে অদ্ভুত একটা গোরু খেদানো শব্দ হট্‌লগরের। সপাসপ মার খেয়ে গোরু দুটো ছুটল গাড়ী নিয়ে। সাঁওতালদের দলটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার গাড়ী।

'বটা—বটা !'··· মেজাজ খিচড়ে গেছে তার।

চলে যাচ্ছে এমনি দলকে দল সাঁওতাল, শুধু আজ নয়—এমনি বহু দিন। হট্‌লগর দেখেছে আর ক্ষেপে গেছে। যাচ্ছে কোথায় কোন খড়্গপুর—রেল কারখানা—কলোনী, আরও দূরে কোথাও খনি অঞ্চলে। মেয়েদের কালো কালো চওড়া পিঠে কচি কচি ছেলে বাঁধা। নেংটি-আঁটা পুরুষগুলোর কাঁধে ভার—তাতে ঘর-সংসার সব বাঁধা ছাঁদা ঃ ছেঁড়া কাঁথা, খেজুর পাতার চ্যাটাই, মায় ভাতের হাঁড়িটি পর্যন্ত। মেয়েদের গায়ে কোমরে যা হোক কাপড় আছে একটু। মরদদের শুধু কাছা আঁটা—ইঞ্চি কয়েক নোংরা কাপড়ের ফালি এক-একটা ঘুরে গেছে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সামনে থেকে পেছনে। এমনি দলকে দল চলে যাচ্ছে পুবমুখো এই শড়ক ধরে। কাঁকর-ভাঙা চওড়া লাল শড়কটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল আর বনবাদাড় ভেঙে। ঘুরে, এঁকে-বেঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে রেল-লাইন এক-একটা স্টেশনে। সাঁওতালরা এসব স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপে না, হাঁটা-পথ ধরে। ট্রেনে চাপলে চাপে গিয়ে একেবারে খড়্গপুরে, সেখান থেকে ছিটকে ছড়িয়ে যায় কে কোথায়, কেউ কেউ থেকে যায় হয়তো বা কুলি লাইনে। সেইখানে পচে—মরে ঃ হট্‌লগরের কথায়—জাত খোয়ায়।

হট্‌লগর এ-সব সহ্য করতে পারে না। কারুর চলে যাওয়া দেখলেই সে ক্ষেপে যায় মনে মনে। তার মনও উড়ু উড়ু করে না যে তা নয়। কিন্তু তার আর যাওয়া হয় না। সে আটকে গেছে। মাস গেল। বছর গেল। থেকে থেকে শুধু সে তেতেই উঠতে লাগল।

গাড়ী হাঁকিয়ে বড় শড়ক ছেড়ে সে ঘুরে গেল ডান দিকে—স্টেশন মুখো। সামনেই স্টেশন। ঘেঁষাঘেঁষি লাল টালির চালা, স্টেশন কোয়ার্টার, দু-একটা খড়ের চালার চায়ের দোকান—এক আধটুক মানুষের সাড়া।

তারপর আর সবটা—ফাঁকা প্রান্তর। তামাটে মাটি ঠেলে বুক চিতিয়ে চিতিয়ে আছে এখানে ওখানে মাটির তলার পাথুরে তরঙ্গ। স্টেশন থেকে কিছুটা তফাতে একটা পোল পেরিয়ে গাছের ছায়ায় গাড়ী থামাল হট্‌লগর। গোরু দুটোকে খুলে বটগাছের ঝুরিতে বেঁধে দিলে। পোলের তলা দিয়ে একটা ঝোরা চলে গেছে চওড়া সোঁতার ওপর দিয়ে উধাও পোড়া প্রান্তরের দিকে, বালি আর কাঁকর ঠেলে। সেই ঝোরার জলে স্নান করে এলো সে, তারপর গাড়ীর ছাউনির ভেতর থেকে টেনে বার করল ঘটি, থালা, একটা ভাঙা কড়াই, পুঁটুলিতে বাঁধা চাল ডাল। রাঁধবে এবার।

গাছের তলায় উনুন পাড়াই আছে—ভাঙা, আস্ত, এমন অনেক। শড়কের ধারে ধারে—গাছের তলায় তলায়। পোড়া কালিমাখা মাটিতে রাঁধাবাড়ার চিহ্ন—কে রেঁধে খেয়ে গেছে। সব দেশছাড়া সাঁওতালদের দল। একটা ভালোমতো উনুন বেছে নিয়ে কড়াই চাপিয়ে দিল হট্‌লগর।

কিন্তু উনুন আর ধরে না কিছুতেই। শুকনো পাতা ডালপালা এনে উনুন প্রায় ভরিয়ে ফেললে সে। ফুঁ দিয়ে দিয়ে গলা শুকিয়ে গেল, ধোঁয়ায় জ্বলে জ্বলে চোখ দুটো লাল হয়ে গেল, নাকের জলে চোখের জলে ভেসে গেল সারা মুখ। উনুন আর ধরে না। গাছের তলা আর শড়কের কিছুটা ভরে গেল ধোঁয়ায়, ধোঁয়ার তাল উঠতে লাগলো আকাশে—হাওয়ায়। শুধু আগুনের দেখা নেই।

এমন সময় একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো হট্‌লগরের পেছনে। সঙ্গে একটি শুকনোমুখো ছেলে বছর বারো চোদ্দর। ওরা বসে ছিল অন্য এক গাছতলায়। ধোঁয়া দেখে এ গাছের তলায় এসে বসল। বসেই থাকল। চুপ চাপ। এদিকে হট্‌লগর ফুঁ দিচ্ছে প্রাণপণে উনুনে।

মেয়েটি বলে উঠল হঠাৎ, 'উ ধরবেকনি।'

হট্‌লগর চমকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলো। দেখল তো দেখলই: চৌকো মুখ একটি মেয়ে, গাল দুটো একটু বসে গিয়ে মুখে এনে দিয়েছে কেমন একটা বিষণ্ণ কাঠিন্য—বছর কুড়ি বয়স হবে জোর। শুকনো শুকনো মুখ, শুকনো শুকনো চুল। তার জাতের মেয়ে। যদিও পরনের কাপড় তার খাটো নয় হাঁটু পর্যন্ত, চুলগুলো কটকটিয়ে বাঁধা নয়—খোলা। পরদেশী-পরদেশী ভাব। কেমন যেন ঢিলেঢালা—ক্লান্ত। তবু জাতের মেয়ে চিনতে কষ্ট হয় না হট্‌লগর মাঝির।

উনুনের দিকে চেয়ে হট্‌লগর বলল, 'শালার ধরতে চাইছে না কিছুতে। দেখ দীকিন হাল্লাকের কাণ্ড।'

'আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। সরে যাও।'

হট্‌লগর খুশি হল। সরে দাঁড়াল।

উনুনের ভেতরে যতো পাতা আর ডালপালা ঠাসা ছিল সব টেনে বার করল মেয়েটি। নিপুণ হাতে উনুন সাজালো আবার। বলল :

'দুটো শুকনো পাতা লাগবেক।'

গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা হাটকে আনল হট্‌লগর যত পারল। কিন্তু অল্প দুটি পাতা উনুনে ফেলে দিয়ে ফুঁ দিতেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

হট্‌লগর হেসে উঠল। বলল, 'বাস্। শালার যার কাজ তাকে সাজে।'

উনুন ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবার বসল গিয়ে ছেলেটার গা-ঘেঁষে।

হট্‌লগর জিজ্ঞেস করল, 'কুথাকে যাবি গো তোরা?'

'পচ্ছিম। সে আনেক দূর।'

পুবে নয়। সেই হতচ্ছাড়া খড়্গপুরের দিকে নয়!···

খুশি হলো হট্‌লগর।

'কুথা থেকে এলি বটে?'

'খড়্গপুর।'

'ভাল—ভাল।'

যাক, একটা জাতের মেয়ে তবু হতচ্ছাড়া ওই খড়্গপুর থেকে চলে এলো তো—এ খুব ভালো কথা। মনে মনে ভারী খুশি হয়। তবু জিজ্ঞেস করল হট্‌লগর, 'চলে এলি কেন?'

'কারখানা থেকে বার করে দিলেক মোদের। মিলিটারী এল। বাপটাকে মোর মেরে ফেললেক উয়ারা। কারখানা বন্দ করে দিলেক।—সে আনেক কাণ্ড।'

আরো খুশি হ'ল হট্‌লগর : এই সেই হতচ্ছাড়া খড়্গপুর—বেজাতের বাজার! সেখানে এমন ধারা কাণ্ড হবেই তো। থু!···

'কি নাম তুমার গ'?'

'কম্‌লা।'

ভাল লাগছে মেয়েটিকে হট্‌লগরের—দরদী, উপকারী। ভালো।···

এবার ছেলেটির দিকে চোখ তুলে বলল, 'উ চ্যাংড়াটো কে?'

'মোর ভাই।'

উনুনে বসান কড়াইয়ের জল গরম হয়ে উঠছে। সেই দিকে একভাবে

চেয়ে আছে কম্‌লা। চেয়ে চেয়ে বুলল, 'সেই খড়গপুর থেকে মোরা হাঁটতে হাঁটতে এলম। দু-দিন মোর ভাইটা খায় নাই কিছু। দুটি চাল নিবে তুমার সঙ্গে ? শুধু ওর জন্যে।'

তাই !··· গায়ে পড়ে উনুন ধরানোর আসল কারণটা এতক্ষণে যেন সাফ হয়ে গেল হট্‌লগরের কাছে। 'সেই যে বলে—কারখানা-বাজার ঘুরে-আসা ফন্দিবাজ মেয়ে বাপুরে—সেয়ানা খুব !' ··· হট্‌লগর সন্ধিগ্ধ চোখে চেয়ে বলল ঃ

'চাল আছে ?'

কম্‌লা মাথা নাড়ল। চাল নেই।

'তবে ? পইসা আছে ?'

তাও নেই। কম্‌লা ফের মাথা নাড়লো।

'তবে ?'—

কম্‌লা ঘাবড়ান' চোখে তার দিকে শুধু চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে বলল, 'শুধু মোর ভাইটার জন্যে।'—

'শুধু এই কটি চাল আছে বেশী।' বলে দেখাল হট্‌লগর বাড়তি চালটুকু। গর্‌-গর্‌ করতে করতে ঢেলে দিল সেই চালগুলো কড়াইতে। বলল, 'দু-দিন খাস নাই—অনেক খাবি তোরা। তো এতে হবে কেনে ! হাঁ।'

মুখ ভার করে গাছ তলায় চেপে বসলো সে। থলে থেকে তার হাতে তৈরী কড়া তামাকের বিড়ি—'চুটা' একটা বের করে কষে টানল কিছুক্ষণ। তারপর শুধালো ঃ

'আর কে আছে তোর ?'

'কেউ নাই আর।'

'তবে ? যাচ্ছিস—থাকবি কুথা ?'

'জাতের মানুষ-জন আছে তো !'—

'যাঃ, উনুনটা নিবে গেল আবার !' হট্‌লগর উঠল।

'বস তুমি—বস।' কম্‌লা উঠল তাড়াতাড়ি। বলল, 'আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

উনুন ধরিয়ে উনুনের পাশে এবারে চেপে বসল কম্‌লা।

হঠাৎ ভাল লাগে উনুনের পাশে বসা মেয়েটাকে হট্‌লগরের। দেখ, তার জন্যে রাঁধছে !··· আবার ভালও লাগে না। বাজার-কারখানা ঘোরা মেয়ে—ফন্দিবাজ। কেমন যেন কায়দা করে তার ভাতে ভাগ বসিয়ে দিল

এই কিছুক্ষণ আগে! এমনিতে বেশ লাগে—যেমনটি তার জাতের মেয়ে হয়। কিন্তু তবু কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে কাঁটার মত। জাত খোয়ান বাজার-কারখানা ঘোরা মেয়ে হাজার হোক।

তবু কথা কয় ওরা—আলাপ করে। আড়ষ্টতা কেটে যায়। হট্‌লগর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চুটা টানে। কম্‌লা উনুনের পাশে পা ছড়িয়ে ভাত রাঁধে। হট্‌লগরের খবর নেয়।

'ই গাড়ী আর গোরু তুমার?'

'তবে?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল হট্‌লগর: মেয়েটা বিশ্বাস করছে না না-কি!

'বেশ ভালো গরু—চম্‌ফল আছে।' কমলা বলল, 'চাষও করে?'

'করে।' তারপর কত জমি চাষ করে, তাও গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিল হট্‌লগর, 'পাঁচ বিঘা।'

কম্‌লা নরম গলায় বললে, 'তুমি মাতব্বর?'

'না।'

তবু খুশি হয়ে হাসে হট্‌লগর। মেয়েটাকে অবাক করে দিয়েছে।

'বউ আছে তুমার?'

'না।' হট্‌লগর বললে, 'এবার ধান কাটার পর হবে।'

'অ।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলে না। হট্‌লগর খুশি হয়ে চুটার ধোঁয়া ছাড়ে। কম্‌লা উনুনে জ্বালানি দেয়। ভাত ফুটছে। কম্‌লার ভাইটা গভীর চোখে চেয়ে আছে কড়াইয়ের দিকে আর জিভের তলায় জমা হওয়া লালা গিলে ফেলছে থেকে থেকে।

হঠাৎ কম্‌লা বলে উঠলো, 'তুমি সুখী লোক—মাতব্বর মানুষ।'

হট্‌লগর কোন কথা বলে না। চোখে মুখে তার নহেলি মাতব্বরের গাম্ভীর্য। কম্‌লাও চুপ ক'রে যায়। তারপর আস্তে আস্তে সে তার নিজের কথা বলে। কাটা কাটা—ছেঁড়া ছেঁড়া।... জবরদস্ত কারখানা বন্ধ—বাপের গুলী খেয়ে মরা—বেকারী—বেইজ্জৎ। তার রুক্ষ চুল—ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখটার গাম্ভীর্য আর ছেঁড়া ছেঁড়া কথা—সবটা তার মুখে এনে দেয় কঠিন এক শ্রীময়তা। সামনের পোড়া প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলে সে। বলে:

'মোর ভাইটা যদি মরদ হত!'

'কি হত তা হলে?'

'কাম খুঁজে নিতম। কাম করতম। ভরসা হত!' কম্‌লা একটু থেমে বলল, 'ইজ্জত দিয়ে কাম করতে নারলম গ'। শেষ চলে এলম জেন্তের মানুষের কাছে।'

হট্‌লগরের মন সত্যি সত্যিই নরম হয়ে যাছে এবার। আহা, একলা মেয়েলোক! বলল, 'তোদের তালুকের নাম কি বটে?'

'পাথরডাঙা!'···

'পাথরডাঙা!'

যে অঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছে দলকে দল—মেয়ে মরদ সব, আর তাই দেখে দেখে ক্ষেপে গেছে হট্‌লগর—কমলা ফিরে চলেছে সেই অঞ্চলে! মনে মনে থমকে যায় হট্‌লগর। চুপ করে যায়। কি বলবে ভেবে পায় না। অথচ কিছু একটা বলার জন্যে মনে মনে সে আকুপাকু করে। শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে ঃ

'যাসনি।'

'কেনে?'

পাথরডাঙার খবর বলল হট্‌লগর।

'তবে?' চোখ-ভরা প্রশ্ন নিয়ে কম্‌লা তাকিয়ে রইল হট্‌লগরের মুখের দিকে।

হট্‌লগর চুপ।

ভাত হয়ে গেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে। মাটির উপরে শালপাতা পেড়ে বসল হট্‌লগর। কম্‌লা বললে, 'মোর ভাইটাকে শুধু অল্প করে দুটি দিয়ে দাও।'

'দিয়ে দে না তুই। মোকেও দে—তুইও দুটি খা।'

দু-দুদিনের না-খাওয়া মানুষ অনেক খাবে বলে এই কিছুক্ষণ আগেই গর্‌গর্‌ করেছে হট্‌লগর। তাই, যদি দিতেই হয়তো তার ভাত-ডাল সেই ভাগ করে দিক। কম্‌লা দেবে না কিছুতেই। তফাতে দাঁড়িয়ে রইল কিছুটা সংকোচে—কিছুটা লজ্জায়। কিন্তু পেটও জ্বলছে। এ দুদিন শুধু শালুকের নাল খেয়ে গেছে। তবু কমলা অনড়। অগত্যা উঠল হট্‌লগর। খেতে বসল তিন ভাগ করে।

খেতে খেতে কিন্তু ওরা কথা বলে বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর মতো। ভালো লাগছে হট্‌লগরের।

কম্‌লা জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে রেঁধে দেয় কে?'

'নিজেই রাঁধি।'

'বহিন, মা—কেউ নাই ?'

'না।'

'তবে তো বড় কষ্ট। তোমার জমি, ঘর, গাড়ী, গরু সব আছে—শুধু একটা মেয়ালোক নাই। বেশ শক্ত, কাজের মেয়া দেখে সাদি কর মাত্‌বর।'

'হুঁ।'

তারপর চুপচাপ কেটে যায় কিছুক্ষণ। দু-জনেই তলিয়ে যায় যেন নিজের কথার মধ্যে।

কম্‌লা বলল, 'আমি যে কি করি!'—বলে সাগ্রহে তাকাল সে হট্‌লগরের মুখের দিকে। হট্‌লগর কিছুই বলে না।

খাওয়া শেষ করে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়েছিল হট্‌লগর। তন্দ্রার মত এসে গিয়েছিল একটু। চট্‌ করে ভেঙে গেল সেটুকু। হঠাৎ মনে হল তার—কড়াই, ঘটি, থালা নিয়ে কম্‌লা গেছে ধুতে—আধমরা সোঁতায়—অনেকক্ষণ। তার ভাইটাকেও দেখা যাচ্ছে না ধারে-পাশে। সব নিয়ে সরে পড়ল না তো মেয়েটা ? ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সে। এগিয়ে গিয়ে তাকাল পোলের নীচে। থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কম্‌লা গা ধুচ্ছে। পরণের কাপড় পড়ে আছে ওপরে—নেমেছে সে আধমরা সোঁতায়। সারা গায়ে জল ছিটোচ্ছে পাখীর মতো। নগ্ন অনাবৃত নিটোল দেহ—হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠছে তার কর্মঠ দেহের পেশীগুলো। উথলে উথলে উঠছে তার যৌবনপুষ্ট দেহ। হট্‌লগর ফিরে এল গাছতলায়। শুয়ে পড়ল আবার—নিশ্চিন্তে। যাক—মেয়েটা পালায়নি তা হলে। চোখ বুজল।

হট্‌লগরের থালা-বাসন সাফ করে গা ধুয়ে গাছতলায় ফিরে এল কম্‌লা। গাড়ীর ভেতরে বাসনগুলো গুছিয়ে রাখল পরিপাটি করে। হট্‌লগর চোখ বুজেই পড়ে রইল। মুখে, গলায় গাছপালার আড়াল দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে। লোকটা ঘুমুচ্ছে ; কমলা দেখল। ভেজা কাপড় একটা শুকোতে দেওয়া ছিল হট্‌লগরের। এখন শুকিয়ে গেছে। সেটা খুলতে লাগল কমলা গাছের ঝুরি থেকে। আবার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল বুকটা হট্‌লগরের—পিট-পিট করে চেয়ে দেখল ; কাপড়টা পরে বসবে নাকি মেয়েটা অথবা সরে পড়বে নিয়ে! না। কাপড়টা অন্য দিক দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধল আবার কম্‌লা। হট্‌লগরের মুখের উপরে এসে-পড়া রোদটুকু আড়াল হয়ে গেল।

খানিক পর কম্‌লা এসে বসল গাছের তলায়। বসে রইল চুপ করে। চেয়ে আছে পোড়া প্রান্তরের দিকে, যেন ভাবছে। ওই রকম অথৈ শূন্যের মধ্যে যেন কুল-কিনারা পাচ্ছে না কিছু।

হট্‌লগর চোখ বুজে ভাবতে লাগল, মেয়েটা জিজ্ঞেস করবে আবার হয়ত—কি করবে সে তাহলে? কোথায় যাবে?

কিন্তু সে আর কিছুই জিজ্ঞেস করল না। হট্‌লগর উঠে জিনিস-পত্র গুছল, হিসেব করল। সব ঠিক আছে।

কম্‌লা ঝুরি থেকে কাপড়টা খুলে গুছিয়ে এনে দিল। বলল, 'তুমার কাপড়।'

ঠিক। ভুলে গেছল হট্‌লগর।

নাঃ, মেয়েটা ভালই! খারাপ মতলব নাই।

সূর্য ঢলে পড়েছে একেবারে পশ্চিম দিগন্তে। ট্রেন আসবার সময় হল। হট্‌লগর গোরু দুটোকে ধীরে সুস্থে জোয়ালে বাঁধল একে একে। সব শেষে চারদিকে একবার চোখ চারিয়ে দেখে নিল—কিছু পড়ে রইল কি-না। আর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মনে মনে।

এমন সময় মেয়েটা কথা কয়ে উঠল আবার ঃ

'চল্যে যাই আবার খড়গপুরে—না হয় খাদে। যা হয় হবেক।'—

ভাইটা ঘেঁষে বসেছে আবার দিদির পাশে। হট্‌লগর চুপ করে দেখল দু-জনকে। বলল আস্তে আস্তে, 'দেব্‌তা মারাং বুরু দয়া করুক, তোর ভাল কাম জুটে যাক একটা হে।'—তারপর চুপ করে গেল। আর কি বলবে সে একটা শুভেচ্ছা জানান ছাড়া? কি একটা অদৃশ্য শেকলে তাকে কে যেন বেঁধে রেখেছে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে। জিভে চুক্‌-চুক্‌ করে শব্দ করল হট্‌লগর; গোরু দুটো চলতে সুরু করল। দু-পা এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে সে বলল আবার ঃ

'যাই আমি। রেল গাড়ী এসে পড়বেক।—'

হট্‌লগরের গাড়ী চলতে সুরু করল স্টেশনমুখো। আরও একবার পেছন ফিরে তাকাল হট্‌লগর কিছুটা গিয়ে। কম্‌লা আর তার ভাই চলতে সুরু করেছে পুবমুখো। সেই খড়গপুর।—ক্লান্ত, মন্থর।...

না—গোরু দুটোকে আর পেটায় না সে ক্ষেপে। সে-ও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গোরু দুটো গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে চলেছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। হট্‌লগর চেয়ে আছে তীব্র চোখে রেল লাইনের দিকে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে যেন অনেক দূরে।

লালাজী আসবে। তার মনিব।

শহরে মাল করতে গেছে—ফিরে আসবে মাতোয়ারা হয়ে। সুতো আর কাপড়ের মস্ত কারবার তার। কারবার থেকে হয়েছে তালুক-জঙ্গল-জমিদারী ফাঁপাই মহাজনী। শহর থেকে ফিরে আসে মদে চুর হয়ে—গাড়ীতে বসে আরও মাতোয়ারা হয়। স্টেশন ঘেঁষা কসৃবী গ্যাঙ-এর বুনো টগুগুলো থেকে টেনে নিয়ে আসে নাগপুরী হাঘরেদের কোনো একটা বেপরোয়া যুবতী মেয়েকে—গোরুর গাড়ীতে চলে ফুর্তি করতে করতে। আর দরাজ হাতে মদের বোতল উপুড় ক'রে দেয় মাঝে মাঝে হট্‌লগরের আঁজলাতেও ঃ

'পিয়ো—তোম ভি পিয়ো বেটা।'

জড়িত কণ্ঠে দিল্‌দরিয়াভাবে হট্‌লগরকে ফি-বারই দানপত্র করে দেয় পাঁচ বিঘা জলজমি, বাস্তু, এই গাড়ী, গোরু—মায় সাদি পর্যন্ত। কখনো বা অপুত্রক লালাজীর একমাত্র ধর্মপুত্র হওয়ার আশ্বাস ঃ

'দিল যব খুল যায় রুপেয়া পইসা ক্যা চিজ হট্‌লগর!'

সেই লালাজীর জন্যে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে আজ হট্‌লগর। ট্রেন আসছে না। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে আজ থেকে থেকে।

ট্রেন এলো। গোধূলির আকাশ তখন কালো হয়ে এসেছে। যথারীতি মাতোয়ারা হয়ে গোরুর গাড়ীতে এসে উঠল লালাজী—সঙ্গে হাঘরের মেয়ে পুন্নি। লালাজী ঢলানো গলায় বলল, 'চল বে হট্‌লগর।'

'আমি যাবনি। লিয়ে যা তোর গাড়ী। আমি চলে যাব।' গোঁয়ারের মতো বলে উঠল হট্‌লগর সহসা। বহুদিন পরে।

'আহ্‌হা! গোসা হৈল হট্‌লগর। কেয়া হুয়া?'

'ঝুটমুট বাত বলিস তুই। জমি দিবি বল্লি, গোরু দিবি, ঘর দিবি, সাদি—'

'আহ হা! লে লে, মেজাজ ঠাণ্ডা কর বেটা। সব দিব। দিল্ যব খুল্ যায়—রুপিয়া পইসা ক্যা চিজ্ হট্‌লগর!' বলে একটা মদের বোতলই গুঁজে দিল লালাজী হট্‌লগরের হাতে, 'পিয়ো।'

ক্ষেপে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বোতলটা হঠাৎ হট্‌লগর। বলল, 'ঝুটমুট বাত বলিস তুই। মোর বাপকে বলেছিলি এই বাত—মোকে বলছিস দেড়কুড়ি দু-বছর ধরে।'

তার রাগ আর কথা শুনে খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল পুন্নি। ঢলে পড়ল লালাজীর গায়ে, 'হায় লালাজী!'

লালাজীর চোখের ইঙ্গিতে মেয়েটা তারপর ঢলে আসে হট্‌লগরের দিকে—দু-হাত মেলে। মাতোয়ারা হয়ে গেছে মেয়েটা। হট্‌লগরের

ক্ষেপে যাওয়া ধাক্কায় ছিটকে পড়ল এসে আবার লালাজীর কোলের ওপরে। হাউমাউ ক'রে উঠল অন্ধকারে।

লালাজী ভয়ে ভয়ে তাকাল হট্‌লুগরের দিকে। ক্ষেপে গেছে। ফুঁসে উঠেছে বত্রিশ বছরের অপেক্ষমান শান্ত মানুষটা বুনো ভ'ইসের মতো। ঝুট বলিয়েছিস তু মোকে—সব ঝুটমুট।'

লালাজী পুন্নির আড়ালে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল হঠাৎঃ বুনো ভ'ইসটা এগিয়ে আসছে। তার রাঙা রাঙা দুটো চোখে হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগুন।

তারপর কি ভেবে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলে সে রাগে গর্-গর্ করতে করতে। সিধে—পুব মুখো।

কতদূর যেতে পারে—কতদূরই বা গেছে সেই মেয়েটা ঃ যার একটা মরদ দরকার, সাহস দরকার—সঙ্গী দরকার তার একলা মেয়েলোকের জীবনে!···

দ্বিতীয় জীবন ॥ ১৯৫৭

বউ

ঘর দোর সব নিকানো—ঝকমক করছে। আনাগোনা করছে দু-চারজন পাড়াপড়শী মেয়ে মরদ। হালকা কথা আর হাসি মস্করা—এদিক-ওদিক হাঁক-ডাক এক-আধটুক্ কারুর নাম ধরে। উৎসবের দিলখুশ মেজাজ সকলের। বর-বউ এখনও এসে পৌঁছয়নি। তাই এক লহমায় বোঝা যায়—সব কিছু তাদেরই অপেক্ষা করছে।

কে যেন বললে, 'অর্জুন এতক্ষণে বউ নিয়ে হাঁটা ধরেছে।'

'রোস—রোস।' কাঁথা মুড়ি দিয়ে দাওয়ার এক কোণে ঝিম মেরে বসেছিল বুড়ী গঙ্গামনি—কথাটা লুফে নিয়ে বললে, 'আসতে সেই এক পহর রাত।'

'বেলা তো গেল গো পিসি।'

'আঁ? তবে ঢের দেরি।' ছানি পড়া সাদা সাদা কানা চোখ দুটো তুলে গঙ্গামনি বলল, 'যাই যাই করতেও সেই সাঁঝ পহরের শেয়াল ডেকে যাবে। বেটির বাপের ঘর ছেড়ে আসা কি সহজ গ!'

'না গো পিসি—অর্জুনের সব টাইম ধরা কাজ। এসে পড়বে সন্ধ্যার আগে। দ্যাখ।'

'কত দ্যাখলম বাপ—জানি।' বুড়ী তারপর হুঁ-হুঁ করে একটু হাসল। বলল, 'মোর কি হল তবে শুন্।' ভাঙা দুমড়ানো কতগুলো বছর পেরিয়ে অর্জুনের ঠাকু'মা গঙ্গামনি গিয়ে পড়ে কবেকার কথায়। ঝড়-ঝাপটা খাওয়া ভাঙাচুরো মুখটায় ঝিলিক দেয় পুরাতন আমেজ। গঙ্গামনি তার শ্বশুরবাড়ী আসার কথা বলে। বরপক্ষ তাগিদ দিচ্ছে—উসখুশ করছে বর। ওদিকে মেয়ের প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আগে কান্নার হাট বসে গেছে। মা-বাপ-ভাই গুষ্ঠিসুদ্ধ যে যেখানে আছে সকলের গলা ধরে ধরে কান্না—তারপর সামনে পাড়াপড়শী যে পড়ে তাদের গলা ধরে ধরে। পথ চলতেও সে কান্না থামে না—অমন দু-তিনটে গাঁয়ের পথ ডাক পেড়ে পেড়ে কান্না। শুনে

ভিন গ্রামের লোক যাতে বলে দিতে পারে—'অমুকের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল গো।'

গঙ্গামনি বলে, 'তারপর তিন দিন মোর গলা বসে গেল।'

মাহিন্দ্রের বয়স ষাট ধরো ধরো—তবু গঙ্গামনির চেয়ে সে বয়সে ঢের ছোট। তবু সে-কালের লোক সে। হেসে বললে, 'একালে অত কান্নাকাটি নাই গো পিসি।'

'কি জানি বাপ্!' গঙ্গামনি ঠোঁট উল্টে বললে, 'একালে সব উল্টা। ঝাঁটা মার।'—

বুড়ীর জরাজীর্ণ কালো মুখটা বিশ্রী বিকৃত হয়ে যায়। গর গর করে হুলো বেড়ালের ক্রুদ্ধ গোঙানির মতো। ক্ষেপে যায় একালের ওপরে। বলে, 'কাঁদবেনি কি গো! মেয়েমানুষ কাঁদবেনি কি! ছাতি ফেটে গেছে মোদের কাঁদতে কাঁদতে মা-বাপের দুঃখে, স্বামীর ঘরের ডরে। কি হবে না হবে—বাপ্ রে বাপ! বুড়া হয়ে গেলম এমনি করে। তবু চোখের জল শুকায়নি।'

ছানি পড়া ছলছলানো চোখ দুটো গঙ্গামনি একবার মুছে নিল ময়লা আঁচলে। কোন্ পুরণো কথা মনে পড়ে গেছে আবার। বকর বকর করে নিজের মনে।

ভিন্ গ্রামের কে একটি যুবক এসে দাঁড়াল এমন সময়ে মাহিন্দ্র মণ্ডলের সামনে—চোখমুখ কেমন চন্‌মনে। বেশ খানিকটা পথ যেন ছুটে এসেছে সে। দম নিয়ে বললে, 'অর্জুন আসেনি এখনও?'

মাহিন্দ্র হাসি হাসি মুখে বললে, 'সে যে বিয়ে করতে গেছে গো!'

'জানি মণ্ডল। কিন্তু এদিকে এক ব্যাপার ঘটে গেছে যে!'

'কি?'

'হাটের পথ থেকে মোদের গাঁয়ের একজনকে ধরে নিয়ে গেছে জমিদারের লোক—গাওনার নাম করে।'

'বেদোর ব্যাটারা এখন মানুষজন গুম করতে লেগেছে তা হলে যে গো! এবার নিয়ে গেল কাকে?'

'বৈরাগ বোষ্টম। জানোই তো—লোকটার মনের জোর নাই মণ্ডল—চাষ আবাদেও মন নাই তার। গান গায় আর ভিখ মাগে। মোদের জ্বালা বুঝবেনি সে। মোদের সব কথা যদি বলে দেয়! অর্জুন গেছে বিয়ে করতে, কোন্‌দিক দিয়ে সে আসবে, কি করবে—যদি তাকে ধরিয়ে দেয়!'—

মাহিন্দ্র চুপ। ভাবছে।…

অর্জুনকে ধরার বহু চেষ্টা চলছে কিছুদিন থেকে। জমিদারের চর, গোয়েন্দা আর পুলিস যেন পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে চষে ফেলছে গ্রামের পর গ্রাম।

'বলো মণ্ডল—তুমি মোদের মাথা, বলো এখন কি করি। অর্জুন তো নাই'—

অর্জুন নেই,—কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে মাহিন্দ্র মণ্ডলের চিন্তাতেও। চাষের ধান উঠে গেছে সব চাষীর ঘরে ঘরে মাঠ খালি করে। শূন্য মাঠ ছিপছিপে কাদায় পড়ে আছে আদিগন্ত। বিরাট জলার চারধারে ছড়ানো গ্রামগুলি শীতের পড়ন্ত বেলায় মিন মিন করছে। মাঠের সমস্ত জমি ভাগ হয়ে গেছে ওই ক্ষুধার্ত গ্রামগুলোর মধ্যে। জমিদারের পোড়া খড়ের ছাউনির কাছারি বাড়ীটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ীর মতো—তার পাইক-পেয়াদা, লোক-লস্কর গোমস্তা সব কে কোথায় উধাও। সামনে যতদূর দেখা যায়—সব এখন তাদেরই মুঠোর মধ্যে। এর চিন্তার দায়ও এখন তাদেরি। অর্জুন হল সেখানে একটা শক্ত খুঁটির মত। কিন্তু সে লোকটাই নেই।

মাহিন্দ্র বললে আস্তে আস্তে, 'সে আসবে কুমিরখালির চড়া দিয়ে—সন্ধ্যার আগেই এসে পড়বে।'

'বাস্। তবে মোরা সব উদিকে ঠিকঠাক রইলম মণ্ডল। অর্জুনকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেবো।'

লোকটি চলে গেল দ্রুত পায়ে।

মাহিন্দ্র মণ্ডল দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। সূর্য অস্তোন্মুখ। আকাশে কালো ছায়া নামছে আস্তে আস্তে। নোনা মাটির কাঁকড়া-পচা গন্ধের গুমোট শীত সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় ভারি হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। মনটাও ভারি হয়ে ওঠে ওইরকম—পুলিসী শঙ্কার নোংরা গন্ধে। মেজাজ এতক্ষণ হাল্কা হয়ে ছিল অর্জুনের বিয়ের উৎসবে। উঠোনের এক কোণ থেকে তখনও ভেসে আসছে বুড়ী গঙ্গামনির একঘেয়ে বকবকানি ঃ 'কম কেঁদেছি গ! বলি মেয়্যালোকের কাঁদার কি আর শেষ আছে গ। পেটে দানা পাইনি, তবু খেটে মরেছি শুধু জল খেয়ে খেয়ে। আর কেঁদেছি মাথা ঠুকে ঠুকে।'—

কথাগুলো কানে এসে লাগে মাহিন্দ্রের—হঠাৎ এক মুহূর্তে বুড়ীর কথাগুলো টেনে নিয়ে যায় তাকে কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত নিঃস্ব দিনগুলোতে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। অনেক কষ্ট পেয়েছে তারা—অনেক সয়েছে, অনেক মরেছে। আজ এক দিগন্তবিসারী জলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে—যার

প্রতি ইঞ্চি জমি শুধু এখন তাদেরই, আর যেখানে খেটে খেটে মরে গেছে তার বাপ-ঠাকুরদা-প্রপিতামহ। এক মুহূর্তে সবটা অসম্ভব মনে হয়। এতগুলো গ্রাম, তার এত ক্ষুধার্ত চাষী, তার এত লড়াই, তার সভা সমিতি সব। সবটা স্বপ্ন বলে মনে হয়।

অত্যন্ত কঠোর সত্যের মতো এই সময়ে অর্জুনকে দেখা যায় জলার পুবদিকে। সেই অসম্ভব নাটকের দুঃসাহসী নেতা। আসছে বরযাত্রী দলবলের সঙ্গে। হলুদ জলে চোবানো বর-কনের কাপড় ঝিলমিল করছে দূর থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মাহিন্দ্র।

মিতবর হয়ে গিয়েছিল পড়শীদের একটা বাচ্চা ছেলে। গঙ্গামনি তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে কনের বাড়ীর কথা।

'হ্যাঁরে—খুব খাওন-দাওন হল?'

'না—তেমন'—

'হবে ক্যামনে!' গঙ্গামনি কথা লুফে নিয়ে খর খর করে উঠলো, 'কুত্তা চাটার পাত যে। কোথাকার কুন্ হাঘরে ঘর কে জানে। ঝাঁটা মারো। তা লোকজন এসেছিল অনেক?'

'না তো'—

'মুয়ে আগুন। শ্মশান নাকি!' ফের সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করল গঙ্গামনি, 'হ্যাঁ র‍্যা, বউ খুব কাঁদল? এই ডাক পেড়ে পেড়ে'—

'কই না তো!'

'ঝাঁটা মারো। তবে মেয়া না ষাঁড় গ—এ্যাঁ।'

'না গো—বউ খুব ভাল।'—

'দূর দূর—যা পালা।'—

আচমকা ঠেলা খেয়ে পালাল ছেলেটা। গঙ্গামনি গরগর করে রাগে। এমন সময় বর-কনে এল সামনে।

মাহিন্দ্র বলে দিল, 'আশীর্বাদ কর গো পিসি—তোমার শূন্য ঘর ভরল এবার। দেখ—বউ দেখ, এই যে'—

'মোর কি চোখ আছে বাপ!'—

রইল বৌ দেখা—হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ী—উথলে উঠে আদ্যিকালের যত কথা—যত শোক। মরে যাওয়া স্বামী-পুত্রেরা, বাপ-মা, ভাই—যত প্রিয়জন ছিল সকলের নাম ডেকে ডেকে, ডাক পেড়ে পেড়ে কাঁদে গঙ্গামনি। কাঁদে তার দিন গেছে বলে—সেদিনের মানুষেরা আর নেই বলে! সে কান্না আর থামে না।

বাড়ীতে বর-কনেকে নিয়ে উৎসবের আয়োজন—পাড়া-পড়শী জড় হয়েছে এসে। বুড়ীর মড়া-কান্নায় উসখুশ করে সবাই। কান্না থামাতে পড়শী মেয়ে ছুটে এল দু-চারজন, অর্জুনও এল। মাহিন্দ্র এসে হাতে ধরল, 'তোর পায়ে পড়ি পিসি—চুপ কর।' কিন্তু সমানে কেঁদে চলেছে বুড়ী—প্রাণপণে। যেন কান্না কাকে বলে—নতুন বউকে শুনিয়ে শিখিয়ে দেবে একবার। অর্থাৎ কি-না মেয়ে হয়ে জন্মেছিস—দেখ কেমন করে কাঁদতে হয়।

শেষ পর্যন্ত নতুন বউ এল। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল পায়ে। বুড়ীর কান্না থামল। কিন্তু গোঁজ হয়ে বসে রইল চুপচাপ। চোখ তুলে একবার তাকালও না।

আর সবাই হারিয়ে গেছে আনন্দ হল্লার মাঝখানে। বুড়ীর কান্না থামিয়ে নতুন বউও উঠে যায় এক সময়ে। গঙ্গামনি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ডাক পাড়ল, 'মাহিন্দ্র!'

মাহিন্দ্র কাছে এল, 'বল পিসি।'

'বউটা ধাড়ী।' গঙ্গামনি মন্তব্য করল।

মাহিন্দ্র গাঁইগুঁই করে বলল, 'না না পিসি—এমন কি'—

তার কথা চাপা দিয়ে গঙ্গামনি বলে উঠল, 'চাপলে কি হবে—হেই যে মোর গায়ে ওর বুক ঠেকল।' তারপর বলে উঠল, 'মোর বিয়ে হয়েছিল ন-বছর বয়সে।'

'বাপ রে, এখন চৌদ্দ বছরের নীচে বিয়ে হলে যে জেল জরিমানা হয়ে যাবে পিসি! সেদিন কি আর আছে?'

'নাই!' ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গঙ্গামনি বলল 'কিন্তু হ্যাঁ র‍্যা, এখন আবার জেল জরিমানা কি? এই তো বলিস—এ গেরাম এখন তোদের। তা তোদের সমিতি না পঞ্চায়েৎ, ডেকে ফের আইন কর তোরা।'

মাহিন্দ্র মাথা চুলকাল। বলল, 'একটু বাড়ন্ত গড়ন—নিজেই পছন্দ করেছে অর্জুন। মেয়েটিও ভাল গো। যেমন মাঠের কাজে তেমন ঘরের কাজে—সবটায় চৌকস।'

'নূতন বউ কাজ করবে মাঠে! বল কি মাহিন্দ্র? মোকে বিয়ে দিল ন-বছর বয়সে। দু-ছেলের মা হওয়ার পরও মাঠে যাইনি।'

'সে-কাল কি আর আছে পিসি। এখন দুধের বাছাও খাটে—তবু সংসার কূল পায় না।'

'কি জানি বাপ্। মোকে বিয়ে দিল ন-বছর বয়সে।' ···

গঙ্গামনি ফের শুরু করে কবেকার ন-বছরের কাহিনী। বুড়ীর কানা চোখে আজকের দিনটায় যেন ঠেসে ধরেছে কবেকার সেই সব কথা।

'শ্বশুর ঘরে আমি তো ভয়ে ডরে মরি। এখন দেখ, নূতন বউ হ্যাঁ-হ্যাঁ করে ছুটছে ঘোড়ার মত। ঝাঁটা মার।'

'কাজ পড়ে আছে পিসি'—বলে মাহিন্দ্র পালাল।

উৎসবের কোলাহল থেমে এল এক সময়ে। এতক্ষণ অর্জুনকে নিয়ে তার ইয়ার বন্ধুরা নাচন-কুঁদন করেছে—হল্লা করেছে। পড়শী মেয়েরা নিয়ে পড়েছে নতুন বউকে। মেঠাই-সন্দেশের বদলে বর-কনেকে মাটির ঢেলা দিয়ে পিটিয়েছে ধপাধপ—পাঁক ছুঁড়েছে পুকুরের। গ্রামের সব চেয়ে প্রিয় মানুষটি আর তার নতুন বউ—দু-জনকে ঘিরে ছোট উঠোনটায় আনন্দের জোয়ার ডেকে গেছে। সমুদ্র ঘেঁষা কোন এক চরের ভাগচাষীর সামান্য এক বিয়ের উৎসব। কিন্তু এমন হল্লা তারা আর কখনও করেনি, এমন ফূর্তি আর কখনও বুঝি হয়নি। এ গ্রাম আজ তাদের, এর প্রতিটি ইঞ্চি জমির মালিক আজ তারা। জমিদারের লটবহর উধাও হয়ে গেছে কোথায়। প্রাণ খুলে হেসেছে সবাই—গান গেয়েছে, নেচেছে অর্জুনকে কাঁধে করে। রাত দুপুর গড়িয়ে ঘরে ফিরেছে সবাই। মেয়েরা নতুন হাঁড়ির ভেতরে বাসর ঘরে জ্বেলে দিয়ে গেছে নতুন প্রদীপ। পড়শী মেয়েরা অর্জুনের বাসর ঘর সাজিয়ে গেছে পরিপাটি করে। বিছানার মাঝখানে শিলের নোড়া একটা শুইয়ে রেখে গেছে—বোধ করি অনাগত সন্তানের প্রতীক, তার দু-পাশে বর-কনে শোবে। তারপর সবটা নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে কোথায় শোনা যাচ্ছে শুধু গঙ্গামনির নাকের ফরুৎ ফরুৎ শব্দ।

বাসর ঘরের এককোণে বুক ভর্তি করঞ্জা তেলের প্রদীপ জ্বলছে একটা। তার ম্লান আলোয় বর কনে তাকাল মুখোমুখি।

অর্জুন মৃদু হেসে বলল, 'মুখের দিকে চেয়ে দেখ কি বউ? আমি কিন্তু বুড়া বর—এই দেখ, দাঁত নাই মোর।'

অর্জুন হাঁ করল।

বউ ঘাড় নামিয়ে বলল, 'জানি। দুটা দাঁত নাই।'

'আগে জানতে?'

বউ ঘাড় কাৎ করে বলল, 'হু, পুলিস তো ভেঙে দিয়ে গেছে। বুড়া হবে কেন?'

'তুমি জানতে সব?' একটা বীর্যবান আনন্দ হঠাৎ বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছে অর্জুনের। শক্ত করে হাত দুটো সে চেপে ধরে বউয়ের।

বউ মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আমিও তো খোঁড়া মেয়া। মোর দাদা বাবা হয়তো তুমাকে বলেনি—ভয়ে। মোর বাঁ পাটায় কিন্তু তেমন জোর নাই—পুলিসের লাঠি পড়েছিল সেই ধান কাটার সময়ে।—তুমি রাগ করবেনি তো?'—

'জানি—জানি—জানি।'—আর কিছু বলতে দেয় না অর্জুন—আর কিছু বলা হয় না। শুধু একটা বোবা আবেগ তোলপাড় করে ওঠে সারা দেহে—মনে। কথা সে বেশী জানে না—রূপ দিতে পারে না সে তার স্বপ্নের, কামনার। ভাষা নেই তার—প্রকাশ করতে জানে না সে নিজেকে। তবু তার হৃদয়ের সমস্ত অবরুদ্ধ আবেগকে প্রকাশ করার একটি পথ সে যেন খুঁজে পেয়ে গেছে আজ একজনের কাছে—সে তার সংগ্রাম, তার ক্ষতচিহ্ন-গৌরব। সেই পথে ফেটে পড়ে তার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যৌবন। সে বোঝে না সব কিছু। তবু, আজই প্রথম উপলব্ধি করে একটা খোঁড়া ষোল সতেরো বছরের মেয়ের লজ্জানত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে—সে তুচ্ছ নয়, সে ঢের বড়। এই মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে সে ভেবে পায় না—দুটো শক্ত বাহুতে শুধু চেপে চেপে ধরে বুকের ওপরে গভীর আনন্দে।

আস্তে আস্তে সে বলল এক সময়ে, 'কাল থেকে বুঝে লাও তুমার সংসার বউ—আমি আর কিছু জানিনি। চাষের একজোড়া বলদ আছে, তিনটা ছাগল আছে আর বাইরে আছে আমার ভাগের চোদ্দ বিঘা জমির ধান।'—

বউ চুপ ক'রে আছে। চোখে স্বপ্নের মতো ভাসছে তার প্রথম যৌবন-মোহের ঘর সংসার প্রিয়জন: সকালে গোরু ছাগলগুলোকে সে মাঠে নিয়ে যাবে। ভাল ঘাস দেখে বলদ দুটোকে বেঁধে দেবে। (আহা, একটি গাই গোরু থাকলে বড় ভাল হত)। ঘর-দোর নিকিয়ে পরিষ্কার করবে। এই লোকটিকে বলবে দু-কলসী জল তুলে দিতে। বাঁ পাটায় তার তো তেমন জোর নেই। তারপর—তারপর, এই লোকটি কোথায় থাকবে তখন—কি করবে তাকে নিয়ে সারাদিন? কি করবে সে?—ঘুম আসছে না কিছুতে। জীবন কি—তা সে জানে না; এখনও বোঝেনি—মাধুর্য তার কোথায়। তবু আজ রাতে, এই সামান্য গেঁয়ো মেয়েটার পক্ষে যতটা সম্ভব—তার বৃহত্তর আর মহত্তর আশাগুলি নিয়ে সম্ভাবনা-সমুদ্রের হাঁটু-জলে একটা বাচ্চার মতো খেলা করে মনের আনন্দে।

রাতের দীর্ঘ প্রহরগুলি গড়িয়ে গেল কোন্ দিক দিয়ে।

শেষ রাতের দিকে ছুটে এল আবার সেই ভিন্ গাঁয়ের ছোকরাটি। এসে ডাকাডাকি অর্জুন মণ্ডলের বাসর-ঘরে। অর্জুন বেরিয়ে এল অবাক হয়ে।

'কি খবর গো !'

ছোকরা বললে, 'তোমাকে এখুনি পালাতে হবে এ গাঁ ছেড়ে।'

অর্জুন হেসে বললে, 'বাসর-ঘর আর নতুন বউ ছেড়ে ?'

'কিন্তু পুলিস আসছে যে ধরতে। খবর পেয়ে গেছে ওরা অর্জুন।' ক'দিনের জন্যে একটু গা ঢাকা দাও তুমি আবার। খবর পেয়েছি ওরা ঘেরাও করবে আজই।'

'পুলিস মোদের বিয়ে-সাদির আনন্দও করতে দিবেনি গো !'

দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নতুন বউ শুনছিল সব। অর্জুন ঘরে ঢুকতেই বউ জিজ্ঞেস করল, 'পুলিস ?'

'হুঁ।' অর্জুন সায় দিল।

'সরে যাও তুমি তবে।'

'যাচ্ছি বউ।' অন্ধকারে পা বাড়াল অর্জুন। বিছানার তলা থেকে কতগুলো কি কাগজপত্র হাতড়ে নিল।

'দাঁড়াও একটু।'

মিটমিটে করঞ্জা তেলের প্রদীপটা খোঁচা খেয়ে জ্বলে উঠল আবার। সেই মিনমিনে আলোয় নতুন বউ গড় করল অর্জুনকে।

অর্জুন বলল, 'গড় করলে যে !'

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বউ বলল, 'ও মা গো, রাতে পা লাগে নি গায়ে !' তারপর মুখের দিকে চেয়ে খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। আস্তে আসে বললে, 'যাও।'

'কিছু যদি হয়'—

'তুমি যাও, কিছু ভাবতে হবেনি। চল এট্টু এগিয়ে দিই।'

পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল বউ খিড়কীর দিকে।

খিড়কীর দরজা পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল অর্জুন আবার। তাকাল বউয়ের মুখের দিকে একবার। মুখটা থম্ থম্ করছে শুধু। দুঃখ নয়— ভয়ও নয়।

বউ তাড়া দিল, 'যাও—দেরি করোনি আর !'—

প্রদীপটা দরোজার আড়ালে রেখে বেরিয়ে পড়ল বউ অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে একটু এগিয়ে দিতে।

'আমার ধান রইল বউ—ঠাকু'মা রইল।'

বউ বললে, 'তোমার সব আমি আগলে রাখব—তুমি চলে যাও জোর পা চালিয়ে।'

ওরা এগিয়ে গেল পেছনের একটা খালের দিকে। কিছুটা গিয়ে বউ দাঁড়াল। অর্জুন এগিয়ে গেল। ঘিরে ফেলল তাকে শীতের অগাধ অন্ধকার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বউ একা—অনেকক্ষণ। এক সময়ে ফিরে এল ঘরের দিকে অন্যমনে।

বক্ বক্ করছে তখন গঙ্গামনি, 'এ কি বউ গো—এ্যাঁ, অ মাহিন্দ্র! বলে কি না, যাও—যাও! বুক না পাষাণ গো! একবার কি হল মোর'—

কেঁদে ভাসিয়ে দেয়েছিল না গঙ্গামনি একবার—স্বামী কোথায় ক-দিনের জন্যে যাবে বলে বেরিয়েছিল। ঘুম ভেঙে উঠে সেই কথা পেড়ে বসে বুড়ী।

মাহিন্দ্র ছুটে এল, 'চুপ দে পিসি—পায়ে পড়ি তোর। বিপদ হবে। চুপ দে।'

'আ গো মা—আমি নিজের কানে শুনলম!'

'এখন চুপ দে পিসি—পুলিস এসে পড়ল বলে।'—

বউ তখন এসে দাঁড়িয়েছে অন্ধকার ঘরে। বিছানাটা খালি—একজন ছিল কিছুক্ষণ আগে! ঘরটা খালি—যার ঘর সে নেই। সবটা কেমন খালি খালি লাগছে। একজন ছিল। একজন নেই। কান্না পাচ্ছে না। শুধু চেয়ে আছে অন্ধকারে। তার বাসর ঘর!—তার এক রাত্তিরের সংসার!

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। খবর রটে গেল—ধরা পড়ে গেছে অর্জুন। তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সেপাই আর জমিদারের দলবল।

মাহিন্দ্র তখন চুল টানছে নিজের—ক্রোধে, ক্ষোভে, 'এ সেই শালা বৈরাগীর কাজ। সব বলে দিয়েছে।'—

'ধরেছে!' নতুন বউ শুধাল দম বন্ধ ক'রে।

'হ্যাঁ—ধরে ফেলল গাঁয়ের শেষ জঙ্গলের কিনারে।'

নতুন বউ পা ঘষটে ঘষটে ছুটল সেই দিকে তার বাসর ঘর ছেড়ে।

ছুটে গিয়ে দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরে অর্জুনকে। একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। ছাড়বে না সে—ছাড়বে না।··· তার কুমারী জীবনের বহুদিনের আশা, তার মাত্র একটি রাত্রির স্বপ্ন—তার অপরিপূর্ণ অনাগত জীবন! শক্ত মুঠি চেপে বসে জোরে অন্ধ আবেগে।

ঝটাপটিতে হলুদে চোবানো শাড়ীটা লটপট করছে মাটির ওপর—ঝিলমিল করছে। পড়শী মেয়েরা একবার তাকাল পরস্পরের চোখে চোখে। শেষে ছুটে গেল হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে।

'তবে রে গুলামের ব্যাটা!'—

এমন সময় বহু দূর থেকে হাল্লার আওয়াজ শোনা যায় ঃ হো ··· ও ··· ও ··· ও।

অগণিত মানুষের কণ্ঠ একটা সম্মিলিত ঐকতানের মত ছুটে আসছে এই দিকে—উধর্ববেগে। বুকের ভেতরে কোথায় যেন ওটা দম আটকে ছিল—আজ নাড়া পেয়ে ফেটে পড়ছে কণ্ঠে কণ্ঠে। পুলিসগুলো সচকিত হয়ে কান খাড়া করে শুনল। দালাল গোয়েন্দারা সভয়ে মুখ চাওয়া চাউয়ি করে। শেষ সবাই মিলে আর একবার হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অর্জুনকে। বউ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে অর্জুণের কোমর।

অন্যান্য মেয়েরা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল বেয়নেটধারী পুলিসগুলোর ওপরে। শক্ত হাতে টান মারে বন্দুক। বহু দূরের শব্দটা ছুটে আসছে এবার কাছাকাছি তীরবেগে ঃ হো—ও ··· ও ··· ও। ···

পট্ পট্। ···

হাওয়ায় রাইফেলের শব্দ ফেটে পড়ে এবার। পুলিস বুখে দাঁড়িয়েছে। চোখে ভয় তাদের—হাল্লার শব্দটা ছুটে আসছে দানবের মত জলা জঙ্গল গ্রাম-গ্রামাঞ্চল ভেঙে। এসে পিষে ফেলবে যেন তাদের। হাল্লা এবার জলার পুবে। আরও কাছে। ছুটে চলে গেল ভয় পাওয়া পুলিসের দল রাইফেলের গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ছোট ছোট ধোঁয়ার পুঞ্জ ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল উত্তরা বাতাসে।

হলদে শাড়ীপরা বউটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে।

'বউ—অ বউ!' একটি মেয়ে এসে চিৎ করে ফেলল বউকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় মাগো!—'

বুকের কাছে হলদে শাড়ীর ওপরে বুলেট ভেদ করে যাওয়ার চিহ্ন। হলদে শাড়ীতে লেগেছে পোড়ার দাগ। অর্জুন চেয়ে আছে ঃ ওইখানে কাল সে পাগলের মত মাথা গুঁজেছিল না!

চেয়ে আছে সবাই ঃ কাপড়ের হলুদ রং ফিকে হয়নি একটুও, হাতের কব্জিতে সুতোয় বাঁধা দুর্বা ঘাসের গায়ে এখনও লেগে আছে শ্যামলের আভা, কপালের ওপরে সিঁদুরের ড্যাবড্যাবে টিপ একটা ভারী মিষ্টি করে তুলেছে কচি মুখটাকে।

অর্জুনকে টেনে হিঁচড়ে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে মরে গেল বউটা ঃ মাহিন্দের কাছে সব কথা শুনে বুড়ী গঙ্গামনি গোঁজ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠল গলা ছেড়ে ঃ

'মোর ঘর যে তবে শূন্য পড়ে রইল মাহিন্দ্র!—মোকে লিয়ে চল সেখানে

একবার। দেখবো আমি—মোর বউ দেখব। মোর সোনা বউ। মোর যে ভাল করে দেখা হয়নি রে মাহিন্দ্র!'— .

মাহিন্দ্রের হাত ধরে ধরে গিয়ে এতক্ষণে নতুন বউ দেখল বুড়ী গঙ্গামনি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদরে, সস্নেহে : 'মা গ ··· মা গ।' ···

ঘরের ঠিকানা ॥ ১৯৫৩

বহিন

রেল কলোনির শহর—এ লাইনের বড় জংশন স্টেশন। স্টেশন ঘেঁষে সওয়া মাইল ঘিরে হাজার বেসাতি, কেরানী কোয়ার্টার আর কুলি লাইন। মাদ্রাজী, সাঁওতাল, বাঙালী আর আদ্রা-গোমো অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের কলকণ্ঠে ভন্‌ভন্‌ করে ছোট জায়গাটুকু। স্টেশন ইয়ার্ডের পাশ ঘেঁষে কিছুটা রাস্তা পিচ ঢালা—সেটা হলো সদর। তার পাশে পাশে বড় সাহেব আর বড়বাবুদের কোয়ার্টার—ঝকঝকে তকতকে, একঘেয়ে। বাকীটা মফঃস্বল। খোয়া ওঠা কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা, ভাটিখানার গোলমাল গালাগালি আর খোলা নর্দমার গন্ধ সবটা মিলে গুলজার। মুহূর্তে মুহূর্তে যেন রং বদলে যায় মানুষগুলোর—রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে জায়গাটার। কাজিয়া, মারামারি, হল্লা আর হাসি।

হৃদয় দত্ত এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। বলে, 'নরককুণ্ড।'

'কেন?' অনিলা বুঝতে পারে না।

'কেন! বুঝবে—দু-দিন সবুর কর। পচে পচে মরবে। হাঁপিয়ে উঠবে।'

কিন্তু অনিলার ভালো লাগে। নতুন জায়গা দেখার আনন্দ তার। পুবে যাও—নদী ঘেঁষে সমতল ভূমি, সবুজের সমারোহ সুরু হ'ল ছলছলিয়ে। আর পশ্চিমে তৃণহীন পাথুরে প্রান্তর—ধূ ধূ করছে। চড়াই উৎরাই লাল মাটির দেশ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ী সীমান্ত এসে শেষ হয়েছে দুস্তর প্রান্তরের ওপারে। ভালো লেগেছে অনিলার। নতুন বিয়ের পর চলে এসেছে স্বামীর সঙ্গে কর্মস্থলে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসার—ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। নতুন দেশ আর মনোবিলাসের প্রচুর অবসর—এতেই খুশি অনিলা। হৃদয়ের উচ্চ অভিলাষের সে ধার ধারে না। দূরে কোথাও কোনোদিন মাদল বাজলে তো আর কথা নেই। বলবে: 'হ্যাঁ গা সেই শালবনে বোধহয়।'

ঘটনাটা আর কিছু নয়, পশ্চিমের প্রান্তরে হৃদয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একদিন মাদলের শব্দ শুনেছিল অনিলা।

হৃদয় দূরের ঝাপসা শালবনের রেখার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'ওদিকে সাঁওতালদের গাঁ।'

'নিয়ে যাবে? আমার যেতে ভারি ইচ্ছে করে।'

'সে যে অনেক দূর! তাছাড়া দেখবে আর কি। সাঁওতালও দেখেছ আশেপাশে আর মাদলের আওয়াজও শুনেছ পাড়ার তাড়িখানায়। সেই রকমই আর কি।'

অনিলা কিন্তু মনে মনে তা মানতে পারে নি। দূরে শালবনের মাদল অন্য রকম। ছবির মত কত কল্পনা যে ঘনিয়ে আসে! শহর ছাড়িয়ে দূরে কোনোদিন তাই মাদল বাজলে অনিলা বলে—'সেই শালবনে বোধহয়।'···

সেই রকম মাদল বাজে আজ। রাত অনেক হয়েছে, থেমে গেছে ছোট শহরটুকুর গোলমাল, হট্টগোল, যাত্রী ওঠা-নামার কোলাহল। বহু দূর থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসে তরঙ্গ তুলে তুলে।

অনিলা বলল, 'সেই শালবনে···'

'তোমার সব সেই শালবনে।' হৃদয় ঠাট্টা করে বলল।

'ওই শোন না—পশ্চিম দিকে।'—

'আমি ভাবছি পুবের কথা।' হৃদয় হেসে বলল, 'কলকাতায় বদলি হলে কেমন হয় বল দেখি?'

'যাবে কলকাতা?'

'চেষ্টা করছি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে একবার ধরতে পারলে হয়ে যায়। মায় প্রমোশন পর্যন্ত।'

'এখানে কিন্তু বেশ আছি।'

এবার জ্বলে উঠল হৃদয়, 'কি আছে এখানে! পচা এঁদো শহর—কুলি-লাইন, আর যত মাতালদের আড্ডা।'—

আর আছে সেই পরিবেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দারিদ্র্য ও জীবনের হাজারো বিকৃতি। ঘেরাটোপের জীবনে চারিদিকে ঠোক্কর খেতে খেতে আরও কোণ খোঁজে মানুষগুলো। পরিধি সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে আসে। সাহেবদের খোশামুদি, রেষারেষি, চুকলি—স্টাফ থেকে স্টাফে, লাইন থেকে লাইনে। তার চেয়ে হৃদয়ের ধ্যান অনেক বড়।

অনিলা বোঝে না। সে চুপ করে স্বামীর বুক ঘেঁষে শুয়ে শুয়ে শোনে কান খাড়া করে বহু দূর থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ।

অনেক দূরে এক জায়গায় মাদলের আওয়াজ তরঙ্গিত হয়ে উঠছে তখন

দমকে দমকে। তৃণহীন পাথুরে প্রান্তরের স্তব্ধতা কেঁপে উঠছে তালে তালে। পুবে কাঁসাই নদীর বিস্তীর্ণ বালুচর আর আনিকাট-বাঁধের পাথর চাপা বদ্ধ জলা; পশ্চিমে খাঁ খাঁ করছে লাল মাটির প্রান্তর। তারাভরা আকাশের মিনমিনে আলোয় সবটা যেন গুম্ হয়ে আছে অসহ্য রিক্ততায়, বঞ্চনায়। এর একান্তে শুধু ডবল লাইনের রেলওয়ে বাঁধের নিচে কোম্পানির ছোট ছোট তাঁবু—কুলি কামিনের আস্তানা, যেন হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেগুলো। আশেপাশে ছড়ানো ছত্রখান লোহা-লক্কড়, কাঁকর-পাথর, পাইপ আর পিচের পিপে। সেখানে অন্ধকার জমাট—উঁচু বাঁধ আর ব্রীজের কালো ছায়া মহাআক্রোশে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখানে। মাদলের শব্দ উথলে উঠছে সেই অন্ধকার থেকে—ছড়িয়ে পড়ছে স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলে। আর হাঁড়িয়ার নেশায় মত্ত এলোমেলো বানানো গান ঃ

পোলটা করলম। লদীটা বাঁধলম
তারপর হাঁড়িয়া খেলম পেটভরে।
এবার ফিরে যাব আমার রাজার* কাছে।
একজন শুধু মর‍্যে গেল।
আমরা পোলটা করলম।···

মিহি ও মোটা গলার বন্য ঐকতান, মাদলের হিন্দোলিত গম্ গম্। জমে উঠেছে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষের নাচগান। আধবুড়ো কাঁধ-মোটা একটা সাঁওতাল পচাইয়ের কলসী ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সকলের মাঝখানে। সেই হল মূল গায়েন। পচাইয়ের লোভে ওদের দলে এসে ভিড়েছে আদ্রা-গোমো অঞ্চলের কিছু মজুরও। তারা নাচ গানের মধ্যে নেই—আছে পচাইয়ে। গানের মাঝে মাঝে শুধু ঝাঁঝিয়ে উঠছে তাদের ইল্লু‌তে চিৎকার। বাধা পড়ল হঠাৎ অতর্কিতে।

গোমো অঞ্চলের ঢেঙাপানা লোক একটা ছুটে গিয়ে চেপে ধরল একটা ডাঁটো মতো সাঁওতাল মেয়েকে। হঠাৎ ঝটাপটি লেগে যায় সেখানে। মেয়েটা গান ছেড়ে চেঁচাতে সুরু করেছে আর বেপরোয়া চালিয়ে যাচ্ছে কিল চড় লাথি। কিন্তু লোকটা তবু ছাড়বে না কিছুতে। ক্ষেপে গেছে, ঠেসে ধরেছে মাটিতে ফেলে।

নাচ থেমে গেল। গান থেমে গেল। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষরা ছুটে এল সেদিকে হৈ হৈ করে। টেনে ছাড়িয়ে দিলে দু-জনকে।

'লিয়ে যা তোদের জেতের লোকটাকে।' আধবুড়ো মূল গায়েন বলল

* প্রিয়

আদ্রা-গোমোর লোকগুলোকে, 'ডেক্যে আনলুম। হাঁড়িয়া দিলম তুদের। শেষে জেত লিবি? যা চল্যে যা, ভাল লেকে লয় বটে তোরা হে।'—

ভালো নয়।

'ঠিক বাৎ।'

'ঠিক বাৎ—মারডালো শালা লছমনকো।'

'ঠিক বাৎ।'

আদ্রা-গোমোর বাকী লোকগুলো রুখে উঠেছে সবাই, 'বেইমান!'

নেশার আমেজে ব্যাপারটা এগোয় না বেশি দূর। লছমনকে মজলিশ থেকে শুধু বের করে দিয়ে ভাঙা দল আবার একত্রিত হয় ধীরে ধীরে।

এই গোলমালের সুযোগে আর একটি মেয়ে বেরিয়ে যায় সবার অলক্ষ্যে। নাচতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে সে—পা উঠেছে কেঁপে। পেটের মধ্যে যেন নড়ে উঠেছে কে হঠাৎ।

নড়ে উঠেছে মেট কিশোরীলালের বাচ্চা।

কেমন যেন ঘাবড়ে গেল সল্‌মা। এক ফাঁকে হুল্লোড়ের আসর থেকে বেরিয়ে সল্‌মা দাঁড়াল এসে উঁচু রেল বাঁধের নিচে স্তব্ধ হয়ে। বিব্রত বিভ্রান্ত।

দূর থেকে ভেসে আসছে অনেকগুলো মিহিমোটা গলার গান—জড়িয়ে জড়িয়ে ভেসে আসছে অর্থহীন নির্বোধ অন্তর্বেদনার মতো। শেষ হাঁড়িয়ার আসর—শেষ উৎসব। কাল থেকে কাজ ছুটি, কতকগুলো বড় তাঁবু উঠে গেছে এর মধ্যে। চলে গেছে সায়েব-সুবো-ইঞ্জিনিয়ার, মেট কিশোরীলাল পর্যন্ত। সাত আট মাস কাজের পর ব্রিজটা শেষ হয়ে গেল। আর কাজ নেই, বাকী বকেয়া পাওনা হিসেব মিটে গেছে। দল ভেঙে যাবে এবার। সকালে উঠে দেখবে সল্‌মা—কাচ্চা-বাচ্চা কোলে কাঁধে করে বোঁচকা-বুচকি হাঁড়ি-কুড়ি ভারে ভারে সাজিয়ে চলে যাচ্ছে তার জাতের মানুষরা সোজা পশ্চিমে, রেল লাইন ধরে। যেতে যেতে মাঝ পথে কারুর কাজ যদি জুটে যায় রেল লাইনে, তবে থেকে যাবে সে। নইলে চলে যাবে। কিন্তু পেটে মেট কিশোরীলালের বাচ্চা নিয়ে সে যাবে কোথায়? তার জাতও যে চলে গেছে ইজ্জতের সঙ্গে সঙ্গে।

ব্রিজের উপর দিয়ে একটা ট্রেন আসছে হুড়মুড় করে—আসছে যেন সমস্ত ভেঙে চুরে, মাদলের উত্তাল আওয়াজ আর বহুকণ্ঠের মিলিত ঐকতানকে মাড়িয়ে পিষে। ওই হুড়মুড় শব্দের মাঝখানে সল্‌মার সমস্ত চেতনা থমকে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে—ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়।

ব্রিজ পার হয়ে ট্রেনটা ছুটে বেরিয়ে গেল পুবে। জনহীন শূন্য প্রান্তরের

স্তব্ধতা ঘোর হয়ে এল আবার। আর সেই অর্থহীন নির্বোধ অন্তর্বেদনার মতো খাপছাড়া ঐকতান ঃ

—তারপর হাঁড়িয়া খেলম পেট ভরে।
এবার ফিরে যাব আমার রাজার কাছে।

রাজার কাছে ···

মহুয়া আর শালবন, পাথর ভাঙা রাঙা মাটির দেশ। কাচ্চা-বাচ্চা বউ নিয়ে ফিরে যাবে সবাই। শুধু সল্‌মা ফিরবে না—জাত দিল যে জামা জুতো পরা অন্য জাতের একটা 'মরদের' কাছে। ফিরবে না আরও একজন। সে মরে গেছে একদিন লোহা-লক্কড় চাপা পড়ে।

বুনো মেয়ের পাথর স্তব্ধ মুখ—চোখে নেই জলের রেশ। নিষ্প্রভ আকাশের আলোয় ঝকমক করছে কাঁসাই নদীর বাঁধ-বাঁধা বদ্ধ জলের মতো—ঘন কালো আর গভীর।

দল ভেঙে গেল পরের দিন ভোরে—চলে গেল পশ্চিমে। সল্‌মা শুধু চলে এল পূবে—সোজা রেল লাইন ধরে একা, বড় জংশন স্টেশনে।

সারা বাজার ঢুঁড়লো সল্‌মা—অলিগলি, মদের দোকান, ভাঁটিখানা। কিশোরীলালের পাত্তা নেই কোথাও। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টের অফিসের সামনে গিয়ে ঘাবড়ে গেছে সে—ফিরে এসেছে ভয়ে। তারপর খুঁজে বের করেছে এস্টাব্লিশমেণ্ট ক্লার্ক হৃদয় দত্তের বাড়ি। আগেও কয়েকবার এসেছে সল্‌মা কিশোরীলালের সঙ্গে এ শহরে। এসেছে, ফুর্তি করে ঘুরে বেড়িয়েছে বাজারের পথে পথে কাজ কামাই করে। তবু রোজের টাকা পাইয়ে দিয়েছে কিশোরীলাল। মদ খাইয়েছে সে—পচাই নয়, বোতলের মদ। তারপদ রাত হলে টেনে নিয়ে গিয়েছে সাইডিংয়ে রাখা খালি মালগাড়ির ভেতরে।

কিন্তু সে কিশোরীলালের সন্ধান পেল না সলমা আজ কোথাও। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসে বসল শেষ পর্যন্ত হৃদয় দত্তের বাড়ির রোয়াকে। অনিলা বসিয়ে রেখেছে তাকে, আলাপ করেছে, জেনেছে সব।

··· হায় দূর শালবন! ···

হৃদয় অফিস থেকে ফিরে এলে অনিলা বলল, 'একটা সাঁওতাল মেয়ে বসে আছে তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে!' হৃদয় জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কোথায়?'

'রোয়াকে বসিয়ে রেখেছি।' অনিলা ফিক্ করে হেসে বলল, 'বড় বিপদে পড়েছে বেচারী। পেটে কার না কার ছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারময়। ওকে কাজ জুটিয়ে দাও একটা!'

'নিজের কাজ কতদিন থাকে তার ঠিক নেই—ছাঁটাই ঝুলছে মাথার উপরে। যত সব অনাসৃষ্টি তোমার। কোথায় সে মাগী।'—বলে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল হৃদয়।

অনিলা ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরের রোয়াক থেকে ভেসে এল স্বামীর দাঁত খিঁচুনি ঃ

'এখানে কি। যা ভাগ।'

'একটা কাম করে দে বাবু।'

'কাম। কামের একেবারে ছড়াছড়ি!'

'তবে কি করবে রে বাবু—বল্যে দে। পোলের কামটা যে কাল শেষ হয়্যে গেল।'

'তা আমি কি করব। কসবী গ্যাঙে চলে যা। ছুই পশ্চিমে।'

সল্‌মা তাকাল বোকা বোকা চোখ তুলে হৃদয়ের দিকে। কয়েক মুহূর্ত। হৃদয় ঘরে ঢুকে দরজা দিল। সল্‌মা আস্তে আস্তে নামল হৃদয় দত্তের রোয়াক থেকে। মুখ মুছল। ঘেমে গেছে হঠাৎ।

··· কসবী গ্যাঙ! রেল-বাবুদের দেওয়া নাম—সেখানে কাম-ছুট্ যত দেহপোজীবিনীর ডেরা। ···

পথে নেমে এগোল স্টেশনের দিকে।

পেছন থেকে কে ডাকল ঃ

'সল্‌মা!'—

সল্‌মা ফিরে তাকাল। চেনা গ্যাঙ্‌ম্যান—বনোয়ারী। সল্‌মা কিন্তু খুশি হয় না। মাথা ভরে আছে অসহায় দুর্ভাবনায়।

বনোয়ারী বলল—'কাম তো খতম।'

'হাঁ!'

ছোট উত্তর। ছোট একটু কথা। তারপর ভিন্ দেশী, ভিন্ জাতের দুটি মজুর আর কোন কথা বলে না। সবটা যেন বলা হয়ে গেছে ওইটুকুর মধ্যে। তারপর যা বাকি—তা শুধু অনুভবের, মর্মান্তিক ভোঁতা বোধশক্তির। সে ওরা দু-জনেই শুধু বোঝে আর পাশাপাশি হাঁটে নিঃশব্দে।

'এইসা হাল। কাম খতম তো বাস্, ভাগ।' বনোয়ারী ফুঁসে উঠল হঠাৎ। 'মোকাবিলা চাই—ইস্‌কা জবাব চাই এক রোজ—চাই জরুর।'

আস্তে আস্তে, জোর দিয়ে দিয়ে বলে বনোয়ারী ভাঙা ভাষায়। সল্‌মাও জবাব দেয় তেমনি। ভাঙা ভাঙা—ঠারেঠুরে। এ যেন এক নতুন ভাষা—

দুটো ক্ষুধার্ত জাতের মানুষের কথা ; ছোট ছোট—সোজা সোজা। ভাঙা হলেও বুঝতে কোথাও কষ্ট হয় না।

'মুলুক যাবে ?' পশ্চিম প্রান্তরের শেষে শালবনের ধোঁয়াটে রেখার দিকে আঙুল তুলে শুধাল বনোয়ারী। বললে, 'কাল কম্‌লা নামে তোদের জাতের একটা মেয়ে বাচ্চা ভাইটার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ে চলে গেল। রেল-কারখানা বন্ধ করে দিল জবরদস্তি—ওর বাপটাও মরে গেল পুলিসের বুট খেয়ে। তুইও তো চলে যাবি—না কি ?'

'না'। সল্‌মা ফিস্ ফিস্ করে বলল—যেন কেউ শুনতে পাবে, 'গেলে জেতের লোক হামাক্ মেরে ফেলবে।'

পেটে তার ভিন্ জাতের বাচ্চা আছে যে একটা !

স্টেশনের প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে ওরা ততক্ষণে এসে পড়েছে নির্জন রেল লাইনের ওপরে। দিনান্তের শেষ আলো তখন ঝক্‌মক্ করছে ইস্পাতের সর্পিল লাইনের উপর।

এবার যেন ওদের ছাড়াছাড়ি হবে এমনি ভাবে ঘুরে দাঁড়াল বনোয়ারী। জিজ্ঞেস করল, 'বিলবাবু কুছু পাত্তা দিলে ?'

অনুকরণ করে বলে সল্‌মা হৃদয় দত্তের কথা, 'বুল্‌লে—চলো যা কসবী গ্যাঙ্ !'

'কসবী গ্যাঙ্।' বিড় বিড় করে আওড়াল একবার বনোয়ারী—দাঁতে দাঁত চিবিয়ে গোঙানো জন্তুর মতো। বললে, 'কাম খতম তো চলে যা কসবী গ্যাঙ—মেয়ে মানুষ হলে রেণ্ডি ব'নে রোজগার কর। আর মরদ হো তো উস্‌কো দালালি কর।'

ক্ষ্যাপা ক্রোধ একটাকে চওড়া বুকের মধ্যে সবলে চেপে গেল সে আস্তে আস্তে। চুপ করে লাইনের কাঁকরগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ—তারপর কাঁকর দেখা সেই একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল সল্‌মার দিকে। বিড় বিড় করে আর একবার বলল, 'কসবী গ্যাঙ—রেণ্ডি গ্যাঙ, তো বানাল কে ?' একটু থেমে বলে উঠল হঠাৎ ঃ

'যাবে ? যাবে সেই কসবী গ্যাঙে বাঁচতে ?'

সল্‌মা তার বুনো চোখ মেলে বনোয়ারীর হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গীমায় অদ্ভুত মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। শেষে আস্তে আস্তে বলল অসহায়ের মতো ঃ

'কুথা যাবে বুঝতে লারছি গো।' চোখে জল এসে গেল ওর।

'তবে চল্।' ঘুরে দাঁড়াল যাওয়ার জন্য বনোয়ারী। চলতে চলতে

বলল বনোয়ারী চাপা আক্রোশে, 'হামি ওই কসবী গ্যাঙ—রেঁণ্ডি গ্যাঙের লোক আছি সল্মা। হামার মা আছে—বহিন আছে তিনঠো'—

আরও আছে বনোয়ারীর বয়সী দু-তিনটে স্ত্রীলোক এবং তাদের পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান-সন্ততির গুষ্টি। সব মিলে এক স্টেশনের পাশ ঘেঁষা ছোট্ট গুটি কয়েক টঙ। জংশন স্টেশনের বাবু-স্টাফ রেলওয়ের ভাষায় ঠাট্টা করে বলে—কসবী গ্যাঙ—রেণ্ডি মেয়ে মানুষের আড়ৎ। রেল লাইনের কাজে ভাসতে ভাসতে কবে কোথা থেকে এসে জমে গেছে হঠাৎ আবর্জনার মত। কে কোন্ দেশী মানুষ—কেউ জানে না, কারুর জানবার দরকারও হয় নি। নোংরা তাপ্পি মারা ঘাঘরা পরনে, আর তেমনি নোংরা রংচটা আঙিয়া—সেঁটে ধরে আছে যেন বলিষ্ঠ কাঠামোর বুকগুলোকে। সারা হাতে উল্কি আঁকা। ঘুষ দিয়ে কাজ বাগায় লাইনে। যখন কাজ থাকে না তখন বিন্নি ঘাস কেটে এনে সারা দিন ধরে ধামা বানায়—গেরস্থালীর টুকি-টাকি জিনিস, খুপী, পেটরা, সাজি। লাল নীল রং করে কাঁধে ঝুলিয়ে বেচতে যায় ট্রেনের যাত্রীদের কাছে অথবা জংশন স্টেশনের বাজারে। রাত হলে কেউ ঘুর ঘুর করে স্টেশনে—মালবাবুর ঘরের কাছে, কেউ দোস্তি করে গিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের গুম্‌টি ঘরে। এমনি চলে এসেছে বছরের পর বছর। এখন তাদের ছেলেপুলেরা মরদ হয়ে গেছে।

এবার আর একজন বাড়ল সেই আবর্জনার স্তূপে। সল্মা।

বনোয়ারীর মা রুকমিনি হাতে ঘাসের পাঁজা নিয়ে অবাক চোখে তাকাল সল্মার দিকে।

'উ তুম্‌হার কাম করবে—সেবা করবে। থাকবে।' সল্মার বোকা বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে বনোয়ারী বলল রুকমিনিকে। আসবার পথে মনে মনে ভেবে সব ঠিক করে ফেলেছে বনোয়ারী।

কিন্তু রুকমিনি অবাক। বাস্! হঠাৎ যেন 'তাজ্জব বাত্' বলে বনোয়ারী। বনোয়ারীর গলা শুনে বেরিয়ে এল বোনেরা।

'আঃ-হা—সল্মা!' বনোয়ারীর তিন বহিন এসে ঘিরে দাঁড়াল সল্মাকে। এক সঙ্গে কাজ করেছে তারা ব্রিজে।

'ই হামার বিবি রঙ্গী।' বনোয়ারী বললে বড় বহিনকে।

'বিবি!' রুকমিনি যাচাই করা চোখে তাকাল বনোয়ারীর দিকে। ব্যাপারটা তার গড়বিড় মনে হচ্ছে। মেয়ে মানুষের চোখ তো।

কিন্তু হৈ হৈ করে ছেঁকে ধরল বনোয়ারীর বহিনরা—ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সল্মা।

রঙ্গী সল্‌মার হাতে টান দিয়ে বললে, 'আরে বহিন!—হামাকে বলিস নাই এতদিন!' ঘুরে রুকমিণীকে বললে, 'আরে—হামরা এক্‌সাথ কাম করেছি যে!...'

'বাস চুক্ গৈল। অব্ চলে হাম।' বনোয়ারী রাস্তায় নামল।

'বনোয়ারী!'—

কোন জবাব নেই আর। বনোয়ারী নিপাত্তা।

রুকমিনি জবাব পায় না কোনদিন। এ ভারী আফসোস তার। জানে না কোথায় চলে যায় বনোয়ারী রাতভর। বলে 'কাম' আছে। কি কাম? আফশোস রুকমিনির: জবাব মেলে না। কস্‌বী গ্যাঙের রুকমিনির 'লেড়কাঠো' যেন অন্য রকমের মানুষ। শুধু একটাই 'মর্দানা' কস্‌বী গ্যাঙের যার 'কাম' রেল লাইনের ধারে ধারে বানভাসী খড়কুটোর মত নয়। সে গ্যাঙম্যান। খুশি রুকমিনি, গর্বিত। কিন্তু বনোয়ারী যেন অনেক কি গোপন করে যায় রুকমিনির কাছে। আফসোস। চাপা গলায় 'বাত্‌চিত্' যত তার 'বহিন'দের সঙ্গে। কি সব কাগজপত্র নিয়ে যায় তারা জংশনে ঘাঘরার তলায় কোমরের ভাঁজে গুঁজে—নিয়েও আসে তেমনি। বনোয়ারী চলে যায় রাতভর—মজলিস থেকে গ্যাঙে গ্যাঙে। কিন্তু তাজ্জব—মাতোয়ারা হয়ে ফেরে না তো কোনদিন! রেণ্ডি গ্যাঙের হালচাল-ছাড়া বেথাপ্পা একটা মর্দানা। কিন্তু সবটা একদিন পরিষ্কার হয়ে গেল রুকমিনির কাছে।

সল্‌মা আর রুকমিনি গিয়েছিল ঘাস কাটতে। মাথার বোঝা নামিয়ে রুকমিনি দেখল—ঘরদোর ওলট-পালট, বনোয়ারী নেই। তিন মেয়ে নেই। কস্‌বী গ্যাঙের আর সব মেয়েরা কাজের ধান্ধায় গেছে কে কোথায়। ঘরের মেঝেয় এক জায়গায় খানিকটা রক্ত লাল দগ্ দগ্ করেছে। রক্তের ধারা ফোঁটা ফোঁটা গিয়ে মিশেছে পথের ধূলোয়। হারিয়ে গেছে।

তারপর ফিরে এলো কসবী গ্যাঙের দুই বহিন—ছেঁড়া ঘাঘরা, ছেঁড়া আঙিয়া। লাইনের কাঁকরে ছড়ে গেছে হাত পা। রুকমিনির ছোট মেয়ে মতিয়া—ঠোঁট ফেটে ফুলে উঠেছে বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোয়। রক্ত জমে আছে চিবুকের কাছে।

মেয়েটা ফোঁপায়, 'টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল রঙ্গীকে।'

'কৌন্?'

'পুলিস। ফৌজ।'...

বড় বহিন রঙ্গীকে নিয়ে গেছে তারা। টানা হেঁচড়া করেছে বহিনরা ওদের সমস্ত শক্তি দিয়ে—শেষতক পুলিস পাকড়াও করে নিয়ে গেল মার-দাঙ্গা

ধস্তাধস্তি করে। এরা পারে নি শেষ পর্যন্ত বন্দুকের—সঙীনের মুখে। বুকমিনির ভাঙা পেটরা—টাকা-পয়সা লোপাট। ইশ্‌তেহার আর হ্যাণ্ডবিল গোছা গোছা টেনে বের করেছে তারা'তিন বহিনের লুকানো নানান জায়গা থেকে।

ছোট ঘরটুকুর মধ্যে ফুঁসে ফুঁসে উঠে ছোট বহিনের ফোঁপানি। বয়স মাত্র হবে ওর ষোল কি সতের—আবেগে কাঁপছে থরথর করে তখনো। আর সব চুপ।

বনোয়ারীকে পাকড়াও করতে এসেছিল পুলিস। তিন বহিন দরোজা বন্ধ করে রুখে দাঁড়িয়েছিল পুলিসের সামনে।

'বনোয়ারী নেহী।'

'ঘর তালাশ করব—ছোড় দরওয়াজা।'

অনেক কি সব কাগজপত্র আছে বনোয়ারীর। তিন বহিন দরোজা আগলে দাঁড়াল—ঘরে ঢুকতে দেবে না। হাল্লা গোলমাল হতে থাকে—এসে জড়ো হয় কসবী গ্যাঙের আর সব মেয়েরা, শেষ জবরদস্তি ধস্তাধস্তি, বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো। ঠেলাঠেলি করে পুলিস ঘরে ঢুকল শেষতক্। ভেঙে লণ্ডভণ্ড করলে রুকমিনির হাঁড়ি-পাতিল।

শেষ পর্যন্ত কিছু 'নিষিদ্ধ' কাগজপত্র তালাশ করে ধরে নিয়ে গেছে রঙ্গীকে থানায়—জেরা করবে।

সব শুনে রুকমিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আর বনোয়ারী ?'

মতিয়া বলল, 'উ ফেরার।'

'ফেরার ?'

মতিয়া বললে, 'হাঁ।'

'তো কাম চলবে কেমন করে ?'

দু'বহিনের প্রায় কেউ কথা বলে না।

রুকমিনি আবার বললে ঝাঁঝাল গলায়, 'কোম্পানির কাম চলবে কেমন করে ?'

মেজ বহিন বললে আস্তে আস্তে, 'কাম তো খতম মা। ভেইয়া ছাঁটাই হয়ে গেছে।'

'ছাঁটাই ! কত দিন ?'

'এক হপ্তা।'

'তো হামাকে বলিস নি কেউ !'

স্তব্ধ বুকমিনি ভাবতে বসল আকাশ পাতাল। সন্ধ্যে থেকে সারা রাত। আফসোস! কিছুই জানে না সে—জানে শুধু বনোয়ারীর কথা তার বহিনরা! এক সময়ে শুধাল সে সলুমাকে :

'তু জানিস?'

সলুমা ছোট্ট করে বলে, 'জানি।'

এ-ও তার সেই বহিনদের মতো। জানে না শুধু বুকমিনি। আফসোস!...

পরের দিন সকালে ফিরে এলো রঙ্গী পাগলীর মতো! চুলগুলো তালগোল পাকানো। আঙিয়া ওর ছিন্নবিচ্ছিন্ন—মুখে, গলায়, বুকে যেন বুনো জানোয়ারের ধারালো নখের আঁচড়। বাইশ বছরের চাওড়া কাঁধ একটা জোয়ান মেয়ে কিন্তু এক রাতের মধ্যে কেমন হয়ে গেছে যেন। সারা মুখে কে ঢেলে দিয়েছে কালি।

বুকমিনি স্তব্ধ চোখে দেখছিল ওকে—পায়ের উপরে রক্তের দাগ লাগা, ছেঁড়া ফাটা ঘাঘরা থেকে মাথার চুলটি পর্যন্ত। রঙ্গীও তাকিয়ে ছিল শুকনো চোখে মায়ের দিকে। তারপর ভেঙে পড়েছিল হঠাৎ কান্নায়, মুখে হাত ঢাকা দিয়ে।

বুড়ো বুকমিনি। তবু লাঞ্ছিত অপমানিত জোয়ান মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। এই রকম ছিন্ন-ভিন্ন, নষ্ট ভ্রষ্ট। চিৎকার করে ওঠে বুকমিনি, 'যা যা—ভেগে যা তুই তোর সেই ভাইয়ার সাথে। বেসরম্! কাঁদতে সরম লাগে না তোর। অব যা—রেণ্ডি বনে যা সব কটা বহিন।'

কেমন একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো! বুঝতে পারে না ঠিক বুকমিনি।

হঠাৎ দিনগুলোর উপরে কারা যেন রেল লাইনের তীক্ষ্ণধার কঠিন কাঁকর বিছিয়ে দিয়ে গেল। কসবী গ্যাঙ, গুমটি ঘর, জংশন স্টেশনের অফিস, কারখানা, কুলি লাইন সর্বত্র একটা দাঁত-চাপা গোঙানি : ছাঁটাই, পুলিস, জুলুম, গ্রেফতার, গুলী-গুপ্তচর। আর কী দম-চাপা ক্ষুধা! এরই মাঝখানে ইস্তেহার ঘোরে কড়া-পড়া নোংরা হাতে হাতে, পোস্টার পড়ে দেয়ালে দেয়ালে—রুটি দো—কাম দো। বারুদ ঠাসা থমকানো আবহাওয়ার অন্তরালে দুর্জ্ঞেয় নিয়তি যেন সুতো কেটে চলেছে দিন রাত্রি ধরে।

বুকমিনি আয়ত্ত করতে পারে না সবটা। এ তার অভিজ্ঞতার বাইরে।

এর ভেতরে একদিন তিন বহিন জংশন স্টেশন থেকে ফিরে এসে খবর দিল, 'হরতাল'। চাক্কা বন্ধ্।'

বিলকুল কুলি কামিন ভোট দিচ্ছে হরতালের পক্ষে; বহুদিনের পীড়নের জবাব।

মতিয়া আঙিয়ার ভেতর থেকে একটা ইস্তেহার বের করলো। বললে, 'ইস্‌মে লিখা হ্যায়।'

বুকমিনি কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করল এপিঠ-ওপিঠ। পড়তে জানে না। চুপ করে বসে রইল। মনের মধ্যে ঝড় বইছে যেন। বেসামাল কথাটা বেরিয়ে এল শুধু মুখ দিয়ে, 'বনোয়ারী ?'···

রঙ্গী চাপা গলায় বললে, 'চুপ। আছে সে—ঠিক আছে।'

আড়ালে সল্‌মা শুনছে কান খাড়া করে।

মতিয়া বললে, 'ই ছ'াটাই, দাঙ্গা, হাম্‌লা, গিরেফ্‌তার—ভুখা, এর জবাব মিলবে তামাম হরতালে।'

বুকমিনি বললে, 'তো কাল হামি ভি ভুট্‌ দিতে যাব।'

'তোমার ভুট নাই—আমাদের ভি নাই।' রঙ্গী বললে আস্তে আস্তে।

তিন বহিন ভোট দেয় নি শুনে হঠাৎ যেন জ্বলে ওঠে বুকমিনি।

'কাহে ? কাহে তু ভুট নেহি দিয়া হারামজাদী ?'

নিয়ম নয়। ভোট দেওয়ার অধিকার শুধু কোম্পানির নোকর—কুলি-কামিন স্টাফের। বাজে ছুট কুলি কামিনের ভোট নাই। এর বেশি বোঝাতে পারেনি তিন বহিন।

'তব ক্যা রেণ্ডি বনেগী ?' বুখে উঠলো বুকমিনি। বুড়ো হাতটা কাঁপছে উত্তেজনায়—কাঁপছে আঙুলে চেপে ধরা ইস্তেহারটা—কাঁপছে লেখাগুলো : রোটি দো—কাম দো। 'বোলো—বোলো।' ···বুকমিনির বুড়ো গলা কাঁপতে থাকে, 'তু কাম না চাও—তু রোটি না মাঙো ? অব তু রেণ্ডি বনো—বাস্‌! তু আপ্‌না ইজ্জত বেচো! কাহে ? কাহে ?'

বুড়ো চোখে, ওর বুড়ো দেহে হঠাৎ জেগে উঠা দীর্ঘদিনের নির্লজ্জ অবমাননার ক্ষোভ ফেটে পড়ে হঠাৎ—যুবতী মেয়েগুলো চেয়ে থাকে তার দিকে দাঁত দাঁত চেপে। ওদের সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে সেই কথাটা—'কাহে ?'

সূর্যাস্তের শেষ আলো ঝিলমিল করছে লাইনের লোহায়—দূর থেকে দূরান্তরে। এর দু-পাশে গুমটিতে গুমটিতে, লাইনে লাইনে চাপা ক্ষুব্ধ গোঙানি একটা পাকিয়ে উঠেছে ক্ষুধার্ত দেহগুলোর পাকে পাকে মা বুকমিনির সারা জীবনের তিক্ততার মতো।

'আরে—ইঞ্জিনার সাহাব!'—

কে যেন বলে উঠলো বাইরে চাপা গলায়।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেবই বটে। ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়ালো একদিন প্লাটফর্মে। সঙ্গে একটি বউ—অল্প বয়সী। লাল সবুজে মেশানো কচি শালপাতার মতো ছলছলানো। দিনান্তের মরা আলোয় পরনের আসমানি শাড়ীতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। ট্রেন চলে গেল। শূন্য প্লাটফর্মের একপ্রান্তে দাঁড়ানো দুটো মূর্তির দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো কসবী গ্যাঙের মেয়েরা।

সেই ট্রেনে জংশন স্টেশন থেকে এল কসবী গ্যাঙের রঙ্গী। সে এসে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের দিকে আঙুল তুলে বললে, 'দেখো হারামীকো!'

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সঙ্গে কে? বহু?'

'বহু তো—লেকিন দুসরা আদমীর বহু। ওর ভেড়ুয়া মরদটা সিগ্রেট আনবার নাম করে উ হারামীর কামরায় বহুটা তুলে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিলে। দেখো না—যাচ্ছে ফুর্তি করতে।'

এ ব্যাপার নতুন নয়—হঠাৎ এ রকম চড়াও হামলার অভিজ্ঞতা আছে কসবী গ্যাঙের। সাহেব আর বউটির মূর্তি দূরে অস্পষ্ট হয়ে এলো। ওরা চলে যাচ্ছে পশ্চিমের প্রান্তরের মধ্যে। দূরে শাল মহুয়ার বনছায়া।

কসবী গ্যাঙের মেয়েরা জিভে চুক চুক শব্দ করে উঠলো। গাল পাড়ল রঙ্গী—কে জানে কার উদ্দেশে:

'ইয়ে কুত্তাকা মাফিক'—

'কার বহু?'

'কে জানে। হোগা, কোই দালালবাবুর।'

সেই দিনই সন্ধ্যের দিকে সেই কার না কারই বহুটাকে কাঁধে ধরাধরি করে নিয়ে ফিরল রুকমিনি আর তার কসবী গ্যাঙের কয়েকটি মেয়ে। বিকেলে দেখা সেই টুকটুকে বউটাকে দেখতে হয়েছে এখন এক রাত হাজতে না কোথায় কাটানো সেই রঙ্গীর মতো। একটা পা মচকে ভেঙে গেছে। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। গায়ে মুখে মদের গন্ধ।

'আরে—কোথায় ছিল এ?' বিকেলে দেখা কসবী গ্যাঙের মেয়েরা জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে।

'একটা টিলা থেকে পড়ে গেল চেঁচাতে চেঁচাতে। ঘাস কাটছিলাম আমরা—ছুটে গিয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে হারামী ইঞ্জিনার সাহেব। আমরা কাস্তে নিয়ে ছুটে যেতে পালিয়ে গেল।'

রঙ্গী ভাঙা ভাঙা ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, 'কাঁহা গেছলে?'

বউটা শুকনো গলায় ঢোক গিলে বললে, 'শাল মহুয়ার বন দেখতে।'

...হায় শাল মহুয়ার বন!...

মতিয়া ওর কাপড়ে মদের গন্ধ শুঁকে বললে, 'দারু পিয়েছ?'

'জোর করে খাওয়াতে চাইছিল!'

কসবী গ্যাংয়ের মেয়েরা চাইল চোখে চোখে। অর্থপূর্ণ মেয়েলি ইশারায়। কার বহু কেউ জানে না—বুঝতে পারছে শুধু একই রকম একটা দুর্ভাগ্যকে। এমন সময় সল্‌মা এসে দাঁড়াল ভিড়ের মাঝখানে—সন্তান ভারাতুর, স্তব্ধ। বউটাকে দেখে বলে উঠল, 'হামি চিনি গ।'

'কে!'

'আরে বিলবাবুর বহু। আহা—বড় ভাল মেয়া গ। হামাক্ একদিন মুড়ি দিলেক—জল দিলেক খেতে।' সল্‌মা বললে দম নিয়ে, 'আর বিলুবাবু হামাক্ সেদিন তাড়িয়ে দিয়ে বললে—চল্যে যা কসবী গ্যাঙ।'

বউটির পরিচয় শুনে মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠে রঙ্গীর। বলে উঠল, 'বিলবাবু! আরে দালাল! আভি চলে হাম জংশন। বলবে বিলকুল কুলি-কামিনকে।'

সল্‌মা বললে, 'হামিও যাব। বলব সে দালালকে যেয়ে—চল এখন তোর নিজের বহু দেখবি কসবী গ্যাঙে।'

বউটা কাৎরে উঠল হঠাৎ।

'আহা রে বহিন!' রঙ্গী আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দিল অনিলাকে।

তিন বহিন আর সল্‌মা নীরবে তাকাল পরস্পরের দিকে।

রঙ্গী দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'চল জংশন—সব বলব হামাদের আদমিদের।'

'চল।'—

ওদের দ্রুত পায়ের শব্দ কর্ কর্ করে উঠল রেল লাইনের কাঁকরে—গ্যাঙে, গুমটিতে, জংশনে—স্টেশনে।

রুকমিনি বসে রইল একা। সামনে শুয়ে আছে বউটা চোখ বুজে মরার মতো। ঘন হয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কুল কিনারা পায় না রুকমিনি।

একটা ট্রেন থামলো—চলে গেল সিটি দিয়ে। তারপর গরুর গাড়ির ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ একটা থামল এসে দমচাপা ক্ষুধার্ত কসবী গ্যাঙের পাশে। মাতোয়ারা গলা শুনা যায় একটা। 'এ পিয়ারী—পুন্নি!'

সেই বানিয়া লালাজী। পুন্নিকে তুলে নিয়ে চলে গেল গরুর গাড়িতে। কাঠ হয়ে বসে রইলো রুকমিনি—শুনতে লাগল সব। আফসোস তার—

নোয়ারী নেই। কর্মহীন ক্ষুধার্ত দিন। কসবী গ্যাঙের মেয়েগুলো ঘুরঘুর করছে কে কোথায়। জোয়ান মেয়েগুলো রেণ্ডি কসবী বনে যাচ্ছে আবার! কাম নেই। চারদিকে ঘেরা কালি-ঢালা অন্ধকারে তারই সারাটা জীবন যেন কে আবার লেপটে রেখে গেছে। তার থেকে বাঁচোয়া নেই—উদ্ধার নেই। ··· বনোয়ারী নেই। বুকমিনির বুড়ো শুকনো চোখ দুটো নিংড়ে জলের ফোঁটা নামল আস্তে আস্তে।

এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল মতিয়া—নীরবে দেখলো শুধু মায়ের চোখের জল।

বুকমিনি বলল আস্তে আস্তে—যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে, 'মতিয়া, সাচ বাত্ বলবি?'

মতিয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মায়ের দিকে।

বুকমিনি বললে, 'বনোয়ারী ভাল আছ?'

'আছে মা।'

'সাচ বাত্?'

'সাচ।'

'একবার দেখা হয় না?'

'জানি না।'

এক রকম—সব বহিনগুলো এক রকম, ওদের ভাইয়ার মতো চাপা। বুকমিনি রাগ করে বসে রইল—আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না।

শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ বুকমিনির রাগ গিয়ে পড়ে সল্‌মার ওপরে। অলক্ষ্মণে মেয়েটা আসার পরই সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল তার সংসারে। বনোয়ারী তো কেটে পড়ল কোথায়, আবার চাপিয়ে গেল একটা বেজাত মেয়েকে। পেটে কার ছেলে কে জানে! এই জন্যই বেটা তার ভেগে গেল জরুর। ···

'জংলী ··· জানোয়ার ··· বাজারচালানী হারামজাদী।' ···

কিছুক্ষণ একমনে গাল পাড়ল বুকমিনি যাচ্ছেতাই করে। সল্‌মা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল এক কোণে। চোখে ওর অসহায় ভয়ঃ যে তাজ্জব লোকটা এনেছিল তাকে—সে নেই।···

বুকমিনি চেঁচাচ্ছে, 'ভাগুক—ভেগে যাক সবাই সেই ফেরার আদমীর সঙ্গে।—না ভাগ্‌বে তো ডাণ্ডা মেরে ভাগাবে সব।'

এমন সময় বহিনরা খবর আনল, 'বনোয়ারীর সঙ্গে দেখা হবে আজ।'

'বনোয়ারী !' রুকমিনি চকিতে মুখ তুলে তাকাল। আগুনে যেন জল পড়ল। 'দেখা হবে ?'

'হাঁ, কিন্তু হুঁশিয়ার। খুব হুঁশিয়ার হয়ে যেতে হবে।'

কোন বহিন বুঝি ফিস ফিস করে কি বললে সল্‌মাকে ঠাট্টা করে। ভয় আর সন্ত্রস্ততার মাঝখানে বোকার মতো তাকিয়ে রইল সল্‌মা। সেই তাজ্জব লোকটার সঙ্গে তবে দেখা হবে তার! সেই যে কবে তাকে রেখে চলে গেছে তো গেছে! বললেঃ বিবি। কেমন বিবি কে জানে! ···

নির্দিষ্ট জায়গায় বনোয়ারী এলো অনেক রাতে।

আর পেছনে পেছনে এলো তার গোয়েন্দা। তারও পেছনে পুলিস—ফৌজ! গ্যাঙে গুমটিতে অসন্তোষের আগুন লাগান লোক একটাকে ধরবার জন্যে তারা বহুদিন থেকে ওৎ পেতে আছে।

অন্ধকারে বসেছিল ওরা বনোয়ারীর সঙ্গে। হঠাৎ শুরু হল এদিক-ওদিকে হুইশিলের শব্দ আর টর্চের ঝিলিক। চারিদিক থেকে ঘিরে এসে দাঁড়াল সঙীন উঁচু করে।

'হাত তোল্—হাত তোল্ সব হারামজাদী—হাথ্ খাড়া উঠাও। জলদি।' ···

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারে বহিনরা। বাঘিনীর মতো সামনে গিয়ে আড়াল করে দাঁড়ায় বনোয়ারীকে। ফেটে পড়ে ক্রোধে, 'আরে হারামী—ভাইয়াকে লেবে! রেণ্ডি বানাবে মাকে, বহিনকে, বহুকে! দুশমন!'—

কিন্তু কোন দিক আড়াল করবে বাঘিনীরা! তিন বহিন্‌কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, পাকড়াও করছে বনোয়ারীকে কয়েকজন।

ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরেছে রুকমিনিওঃ যেতে দেবে না বনোয়ারীকে। চেঁচাতে থাকে সে। চেঁচানি শুনে ছুটে আসে কসবী গ্যাঙের মেয়েরা—বেকার আর নেশাখোর মরদেরাও। শেষ বারের মত তারা যেন ঋজু হয়ে দাঁড়ায় গুলী খাওয়া শিকারী বাঘের মত। বনোয়ারীকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া ধস্তাধস্তি চলে রেল-লাইনের কাঁকরের ওপরে। অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না—কচ্ কচ্ করে ফুটে যায় শুধু ধারাল সঙ্গীনগুলো। হটে যাচ্ছে।—পাগলের মত রেল-লাইনের কাঁকর আঁচড়ায় মেয়েগুলো—মা বহিন বহু। হটে গেল ওরা। চোখ কানা-করা কি একটা ধোঁয়ার তালের মধ্যে দিশাহারা হয়ে যায় ওরা শেষ পর্যন্ত।

মতিয়া চিৎকার করে ওঠে, 'আম্মা!'—

'ছোড়ো মৎ রঙ্গী—ছোড়ো মৎ মুন্নি!' ধোঁয়ার তালের মধ্যে রুকমিনির দম-চাপা খ্যাপা-গলাটা শোনা যায় শুধু।

মতিয়া কেঁদে উঠল আবার, 'কিছু ঠাহর হচ্ছে না। আব্বা হো পিয়া—আব্বা হো পিয়া। আম্মা!'

'ছোড় মৎ—ছোড় মৎ।'...

'আঁ—!'—

'ও হো—হো।' মতিয়ার কচি গলার একটা ফোঁপানো কান্না ঠেলে আসে শুধু। ওরা হেরে গেল। ওরা মাটিতে লুটোচ্ছে। ওরা তবু ফুঁসছে—যেন বেকায়দায় ডাণ্ডা খাওয়া একপাল গোখরো।

রাত আবার গভীর হয়ে এল কসবী গ্যাঙের অন্ধকার ঘিরে। ক্ষোভে ব্যর্থতায় ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে ফিরে এসেছে সবাই। অভিব্যক্তিহীন শূন্য চোখে ফোঁপাচ্ছে মতিয়া অসহ্য যন্ত্রণায়—তার পাশে দু-বহিন স্তব্ধ। রুকমিনি দুয়ার ধরে হাঁ করে চেয়ে আছে অন্ধকারের দিকে।

হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হল রঙ্গীর—অন্ধ বহিনটাকে ধরে বসে আছে তারা দু-জন, কিন্তু সল্‌মা কোথায়? অনেকক্ষণ হয়ে গেল—সবাই ফিরে এল লাইনের ওপর থেকে, সল্‌মা তো ফেরে নি!

পায়ে পায়ে এগোল রঙ্গী লাইনের দিকে।...

না, ফেরেনি শুধু সল্‌মা। লাইনের ওপরে বসেছিল সে একলা, অনেকক্ষণ। শ্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে যেন বসে পড়েছে এক জায়গায়। তারপর বসে বসে ভাবছে—এবার যাবে সে কোন দিকে। চেয়েছিল অন্ধকারে—বনোয়ারীকে যেদিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে। শুধু একবার তাকিয়েছিল সে তারা-ভরা পশ্চিম দিগন্তের পানে—যেদিকে তাদের সেই ফুলবনী গাঁ। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে চলতে সুরু করেছিল ব্রীজের দিকে। আর কোথায় যাবে—ভিন্‌জাতের একটা মানুষের বাচ্চা পেটে নিয়ে? ব্রীজের ওপরে কিছুটা এসে সে দাঁড়াল ধার ঘেঁষে, কোমরে কাপড়টা জড়াল ভাল করে। পিঠভরা কালো চুল বাঁধলো শক্ত করে। তারপর তাকাল ব্রীজের তলায়—যেখানে কালো পিচের মতো জল জমাট অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লোহার রেলিং টপকাবার জন্যে পা তুলল।

'সল্‌মা!' পেছন থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল।

চম্‌কে পেছন ফিরে তাকাল সল্‌মা। রঙ্গী ছুটে আসছে ওর দিকে।

এসে চেপে ধরল ওর হাত। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আরে বহিন, এখানে মরতে এসেচিস! কাহে? কাহে? কাহে বহিন? ঢ়ুঁড়ে ঢ়ুঁড়ে হামি তোর পাত্তা পাই না। চল।'—

সল্মা তাকাল শূন্য চোখে। যেন অবাক হয়ে বলল সল্মা আস্তে আস্তে, 'কুথাকে!' চেয়ে রইলো বোকার মতো।

'ঘরে যাবি না?'

'ঘর?' তবু চেয়ে আছে সল্মা—যেন বুঝতে পারছে না। ঘর কোথায় তার? যে এনেছিল তাকে একদিন—সে আজ চলে গেল। কে জানে কতদিনের জন্যে। যাচ্ছেতাই করে গাল পেড়েছে রুকমিনি আজই। বুনো মেয়েটার চোখ ছলছল করে এল।

'আরে বহিন।'—কর্কশ গলাটা কাঁপে রঙ্গীর। হাত ধরে টান মারে সল্মার। 'চল বহিন। বনোয়ারী এসে শুনলে কি বলবে! যতদিন সে নাই—ততদিন আমরা তো আছি! তোর লেড়কা হলে মানুষ করবো তাকে সবাই মিলে। তারপর ভাইয়া এলে'—

গলা কেঁপে থেমে গেল রঙ্গীর। বুনো মেয়েটা ফোঁপায় রঙ্গীর কাঁধে মুখ গুঁজে—দুঃখে নয়, তার অথৈ নিঃসঙ্গতার মাঝখানে আত্মীয়-হৃদয়ের সহানুভূতিতে। শুধু বোবা সাক্ষীর মতো আকাশে নির্জন গভীর এই রাত্রির অগণিত নক্ষত্র যেন দীপ্ত চোখে চেয়ে আছে গলায় গলায় জড়ানো ভিন্ জাতের এই দুটো মেয়ের কান্না-ভেজা মুখের দিকে।

ঘরের ঠিকানা ॥ ১৩৬০

★

বেটি

সেই ডোরা-কাটা হাফ সার্ট পরা ছোঁড়াটা এসেছে আবার। পান্তি তাকে পিঁড়ি পেতে দিয়েছে দাওয়ায়, খাতির যত্ন ক'রে আবার তামাকও সেজে দিয়েছে। দিয়ে নিজে পাশের একটা খুঁটিতে দাঁড়িয়েছে ঠেস দিয়ে। দেখে গা জ্বলে গেছে মথুরা দাসের—মুখের চেহারা ততোধিক পোড়া। মথুরাকে দেখেই পান্তি অবিশ্যি চলে গেল ঘরের মধ্যে—তবু চলে যাওয়ার সময় তার চোখের কোণের বাঁকা চাউনি আর ঠোঁটের চাপা হাসি চোখ এড়াল না মথুরার। মেজাজ আরও বারুদ। তবু সব রাগ চেপে সহজ ভাবে কথা বলতে হল তাকে ডোরা-কাটা সার্টের সঙ্গে ঃ

'সব ভাল তো হারাধন।'

কিন্তু রাগে ফেটে পড়ল সে হারাধন চলে যাওয়ার পর। হাঁক পাড়ল, 'পান্তি!'—

'কি বাবা!' পান্তি সহজভাবে বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে—দাঁড়াল এসে বাপের সামনে।

'ওই হারামজাদা ছুঁচোটা এসেছিল কতক্ষণ?'

পান্তি অবাক হয়ে তাকাল বাপের মুখের দিকে—ওর সম্বন্ধে এত মিঠে মিঠে বুলি এর আগে কোনদিন শোনেনি ব'লে। তবু পান্তি সহজ সরল ভাবেই বলল, 'তা অনেকক্ষণ এসেছে তো—বেলা ছিল তখন। বসেছিল তোমার জন্যে।'

'ব-সে ছি-ল!' মথুরা খেঁকরে উঠল, 'আবার খাতির ক'রে পিঁড়ি পেতে তামাক সেজে দেওয়া হয়েছে। গাঁয়ের সকলের কথা-টথা খুব শুধোলে না?'

'তা ভাল-মন্দ সব শুধাল তো!'

'আর আমি সব বললাম।' পান্তির গলার নকল ক'রে মথুরা ভেঙিয়ে উঠল। হুংকার দিয়ে বললে, 'ও এলে ফের যদি তুই ঘরের বার হবি

হর‍্যামজাদি! ধাড়ী মেয়া—লাজ সরম নাই তোর! অর সঙ্গে অত খাতির কিসের?'

হায় কপাল! পান্তি অবাক। অবাকই তো—কি বলে তার বাপ! বিয়ে-সাদির সব ঠিকঠাক, মায় কনে-পণের টাকা পর্যন্ত কিছুটা নেওয়া হয়ে গেছে হারাধনের কাছ থেকে—দশ গণ্ডা টাকা, বর্ষার সময়ে। সেই টাকা ভেঙে খেয়েছে, চাষ-আবাদ করেছে। এখন কার্তিক মাস—ফসল ওঠার দিনও আর বেশী বাকী নেই। কথা আছে—ফসল উঠলে বিয়ে-সাদি চুকবে। এত কথার পরে হঠাৎ বাপ তার আজ বলে কি আবার!

মথুরা দাঁতে চিবিয়ে বলল, 'ও এলে লাথ মারবি এবার—লাথ, বুঝলি?'

'মোকে বলা কেন।' পান্তি বলল গজ গজ ক'রে, 'টাকা খেয়েছে যে—লাথ মারতে হলে সেই মারুক।'

'মারব তো—আমিই মারব এবার এলে। বেদোর বাচ্চা আমার হবু জামাই সেজে এসেছে, না জমিদারের গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে।'

এমন সময় আর একটি আধ বুড়ো মানুষ নিঃশব্দে দাওয়ায় এসে বসল। তাকে দেখে তিনগুণ মেজাজ চড়ে গেল মথুরার। বলল, 'শোন ভুতু খুড়া শোন, মোকে বলে ধান লুট করতে কে কে গেছল, নাম বলে দাও। না হ'লে জমিদারের পাইক, পেয়াদা, পুলিশ-গারদ নানা হ্যাঙ্গামা হুজ্জুৎ হবে। মোকে লোভ দেখায়—'

'কে!' ভুতু খুড়ো জিজ্ঞেস করল ঠাণ্ডা গলায়।

'কে আর—মোর হবু জামাই, শালা জমিদারের নফর, হারধন।'

আস্তে আস্তে নিজ-মূর্তি ধরছে এবার পান্তি। বলল, 'ধান লুট করেছই তো। লুটে আনলে তো সবাই।'

'বেশ করেছি। মোরা চাষ করেছিলাম আধ-পেটা খেয়ে—মোদের ধান, মোরা এনেছি। না আনলে না খেয়ে মরতিস যে হারামজাদী। এই বলে দিলম—এক কথা মোর, ফের যদি ও আসে—'

'টাকা খেয়েছ তখন—আসবেনি আজ!' কোমর বেঁধে পান্তি রুখে দাঁড়াল।

মথুরা ভুতু খুড়োর দিকে চেয়ে বলল, 'দেখ, মোর মেয়ার ভঙ্গী দেখ খুড়া।' মথুরা হুংকার দিল, 'কেটে ফেলাব বলে দিলম—দু'খণ্ড ক'রে ভাসিয়ে দেব গাঙে।'

'গুণের বাপ মোর—তিন তিনবার বেচলে মোকে লোকের কাছে—কোথায় না কোথায়। চলে তো যেতম মোর কপাল নিয়ে—ডেকে ফুসলে

আনলে কেন ফের। কাট না—কেটে ফেলাও মোকে—একেবারে শেষ করে দাও।'

মুখবাজ মেয়েটা রুখে দাঁড়িয়েছে মরিয়া হয়ে।

'বেচলম—হাঁ আমি বেচলম।' বোকা হাবার মত হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল শেষ পর্যন্ত মথুরা। ওর রোগা শুটকো বুড়ো মুখটার রেখাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল আবেগে—কোটরে ঢোকা দুটো চোখের জল হয়ত বেশী ছিল না, সামান্য দু'ফোঁটা দু'চোখের কোণে শুধু উপচে উঠল। বলতে লাগল সে মাঁথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, 'বেচলম পেটের জ্বালায়—বেচলম তোর মাকে বাঁচাব বলে, তোকে বাঁচাবো বলে। ওরে, তুই কি জানবি—'

মথুরাকে টেনে নিয়ে গেল ভূতু খুড়ো, 'কেঁদোনি—চল, চল মোর ঘরে। মোদের দুঃখের কথা ওরা কি জানে। চল।'

মথুরা কাঁধের নোংরা গামছায় চোখ মছতে মুছতে বলল, 'ওই জমিদারের নফর হারাধনের সঙ্গে মোর মেয়ার বে-সাদি আমি কিছুতেই দেব না খুড়া। তখন না বুঝে পণ নিয়ে ফেলেছি—কিন্তু ও না চাষী, না বুঝে চাষ আবাদ। না তার দুঃখ কষ্ট। ও নফর—চাকর।'

'ন্যায্য কথা।'

'মোকে বলে কি-না—'

'চুপ কর মথুর। মাথা গরম ক'রনি। এখন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার সময়।'

মথুরা চুপ করল। নীরবে হেঁটে চলেছে দু'জন ভেড়ি-বাঁধের ওপর দিয়ে—দু'পাশে গর্ভিনী ধানগাছের হিন্দোল। ভূতু কি যেন ভাবছে—ওর কুঁচকানো কপালে চিন্তার কালো ছায়া।

এক সময়ে মথুরা আফসোস ক'রে ব'লে উঠল, 'মেয়াটার মোর স্বভাব খারাপ হয়ে গেল—ভারি মুখবাজ।'

'কত জায়গায়—কোথায় না কোথায় রেখে এসেছিলে মথুরা। পাঁচ জায়গায় ঘুরে ভয় ডর আর নাই। কথায় বলে—নারী নষ্ট হাটে। তাছাড়া বয়সকালের মেয়া তো!'

মথুরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মোর কপালের দোষ।'

কপালের দোষ বৈ কি। ওর ঘটি নেই, বাটি নেই—গরু নেই, জমি নেই। আছে ওই এক মেয়ে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালে দুর্ভিক্ষ হল দেশ জোড়া। মথুরের বউ ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতে বাঁচতে শেষে অসুখে পড়ল। কি অসুখ কে জানে, পেটের জ্বালায় আর চেঁচালও না, ঝগড়াও করল না। শুধু ঝিম

মেরে যেতে লাগল দিনকে দিন। শেষকালে মথুরা একদিন বছর চারেকের মেয়েটাকে কাঁধে করে হাঁটা দিল আধা শহরে জায়গা এগরা বাজার।

'মেয়েটাকে লেবে বাবু—পাঁচ দশ টাকা যা হয় দাও। ও বাঁচবে তোমাদের এঁটোকাঁটা যাই হোক খেয়ে। মোর বউটাও বাঁচবে বাবু। হেই বাবু, একদম সচ্চাষীর মেয়া—জাত অজাত নয়।'

ঘুরতে ঘুরতে কোন ডাক্তারের কাছে গছিয়ে দিয়ে এসেছিল পাস্তিকে মাত্র পাঁচ টাকায়। দুর্ভিক্ষের বছর দু-তিন পরে একবার ফসল হল ভাল। সঙ্গে সঙ্গে মন উসখুস ক'রে উঠল মথুরার মেয়েটার জন্যে। মণ খানেক ধান বেচে ট্যাঁকে টাকা গুঁজে চলল মথুরা মেয়েকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু ডাক্তারের বাড়ীর সামনে গিয়ে হঠাৎ ভয় ধরে গেল তার—চাইলে যদি না দেয় মেয়েটাকে! আর পড়বি তো পড়, মেয়েটাও পড়ে গেল সেই সময় সামনে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন মুচড়ে উঠেছিল তার! আর কোন ভাবনা চিন্তা নয়—মেয়েটাকে সোজা কোল-পাঁজা ক'রে দে ছুট। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল মেয়েটা—তার মুখে হাত চাপা দিয়ে সড়ক রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে বনবাদাড় ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট। ক্রোশ খানেক একভাবে ছুটে এসে মেয়েটাকে একটা ঝুপসি বনের আড়ালে নামিয়ে দম নিয়েছিল। মেয়েটা কেঁদে উঠেছিল ভয় পেয়ে। মথুরা আদর করে বলেছিল, 'ভয় প্যাসনি মা—আমি তোর বাপ। তোর নিজের বাপ আমি, বেচে দিয়েছিলম পেটের জ্বালায়।'

মথুরার বেচার মত ওই একটি জিনিসই আছে এবং একবার বেচে বারবারের সাহসও বেড়ে গেছে। এমনি ক'রে দু'পাঁচ বছর কাটে—আবার বেচে। সুদিনের মুখ দেখলে আবার চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েও আসে।

কিন্তু ডাগর মেয়ে এবার রুখে দাঁড়াতে শিখেছে। বুঝতে শিখেছে—বাপ তাকে বেচে বেচে দেয়। আড়ে-চাড়ে ভরেনি বটে—তবু বয়স তো হল ওর সতেরো। শেষের দিকে কোন এক সাহু বাড়ীতে এঁটো পাত খেয়ে খেয়ে ধিকিয়ে ধিকিয়ে বেড়েছে বেওয়ারিশ জীবের মত। দেহে যৌবন এসেছে—নিতান্ত না এলে নয় বলে। এই ডাগর মেয়ে—ডাগর হয়েছে পরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে, বাঁচার তাগিদে ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে ক'রে। সে মেয়েকে সহজে স্বমতে বাগ মানাবে কি ক'রে মথুরা দাস।

পারবে না। এ মেয়ের এখন নিজের পছন্দ অপছন্দ হয়েছে।

দু'চার দিন যেতে না যেতেই মথুরা বুঝল কথাটা ভাল করে। কারণ, আবার সেই ডোরাকাটা হাফসার্ট এল। পাস্তি গেছল জল আনতে—তার

সঙ্গে দেখা ঘাটের কাছে বটগাছের তলায়। মাঠের ধারের পুকুর—লোকালয় থেকে দূরে, নির্জন। চারপাশ জুড়ে শুধু সবুজ ধানক্ষেতের তরঙ্গ।

ডোরাকাটা সার্টের সাহস বেড়ে গেছে। সে সোজা আজ পান্তির হাত চেপে ধরল। তার পণ দিয়ে বায়না করা বউ।

কিন্তু পান্তির ভয়—বাপের যা মতিগতি, বিয়ে যদি না দেয়! ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল পান্তি! বললে, 'বাপকে মোর ভয় হয়, নিষ্ঠুর বাপ মোর।' মেয়েটার চোখে জল এসে গেছে সতের বছরের নির্বোধ গেঁয়ো আবেগে।

হারাধন জবরদস্তি আদর ক'রে বললে, 'ভয় কি—মোরা তো পালাব এ গাঁ ছেড়ে। এ গাঁয়ে হাঙ্গাম হুজ্জুত হবে—পুলিস আসবে আর দু'দিন বাদে, দেখ না। একথা বলিসনি কারোকে।'

'বাপকেও ধরবে মোর তবে!'

'আসল দোষী ধরা না পড়লে নির্দোষী তো ধরা পড়বেই। ধানের গোলা লুঠ—যে-সে কথা!'

'সবাই তো দোষী—পেটের জ্বালায় সবাই তো খেয়েছে। সবাইকে ধরুক তা হলে।'

'আসলে এ মতলব দিচ্ছে যারা জমিদার তাদেরই চায়।'

তাদের চেনে না পান্তি। শুধু একটা ফোঁপানি ঠেলে আসে বুকের ভেতর থেকে।

কেমন একটা দুর্দিন ঘনঘোর হ'য়ে আসছে চারদিক থেকে।

ভয়ে কেঁদে ফেলে পান্তি।

হারাধন ফের জবরদস্তি আদর ক'রে আশ্বাস দিল, 'মোদের ভয় কি। বরং জমিদার বলেছে, বিয়ে-সাদি চুকে গেলে ঘর ক'রে দেবে মোদের—বাস্তুর ভিটে দেবে একটুন।'

অনেকক্ষণ কেটে গেল পান্তির জল আনতে গিয়ে। মথুরা তখন দাওয়ায় বসে আছে গুম্ মেরে। পান্তি ফিরে এলো প্রায় সন্ধ্যে লাগিয়ে। মথুরা তাকাল তার দিকে একবার কটমট ক'রে। আফসোস করতে লাগল মনে মনে—মেয়ে তার বড় হয়ে গেছে, গায়ে হাত দেবে কি করে! নইলে আজ হয়তো রাগের মাথায় বসিয়েই দিত ঘা কতক। ডাগর হয়ে গেছে মেয়ে—এখন গরীব বাপ আর ওর কেউ নয়। কথায় বলে—মেয়ে হল পরের জন্যে, পরের ঘরই তার আপন। সেই আপন ঘর বেছে নিয়েছে পান্তি: হতচ্ছাড়া হারামজাদা সেই ডোরাকাটা হাফ সার্ট।

'মরুক।'—মনে মনে গাল পাড়ল মথুরা। দাওয়ায় অন্ধকারে বসে রইল ভূতের মতো।

পান্তি সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজাতে যেতেই রাগে ফেটে পড়বার সুযোগ পেলে মথুরা। হুংকার দিয়ে বলল, 'খবর্দার বলছি—শাঁখ বাজাবিনি।'

পান্তি অবাক্ চোখে তাকাল বাপের দিকে। বলে কি! চাষীর গাঁ! কার্তিক মাস। মাঠের ধানক্ষেতে লক্ষ্মীর আসন পাতা হচ্ছে—দু'দিন বাদে ফসল আসবে ঘরে। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে ভাগ্য-লক্ষ্মীর নাম স্মরণ করে গাঁয়ের মেয়ে-বউ, লক্ষ্মীর পাঁচালী শোনে এ সময়ে। আর তার লক্ষ্মীছাড়া বাপের হুকুম কি!

'মরুক আমার কি!'—পান্তি রাগ ক'রে শাঁখ তুলে রাখল।

মথুরা ফের হুংকার দিলে, 'শাঁখ আর কোন দিন বাজাবিনি বলে দিলম।'

পান্তি মনে মনে গজ্ গজ্ ক'রে বলল, 'শুধু এই লক্ষ্মীছাড়া ঘরটা বাদ দিয়ে রাজ্যের ঘরে লক্ষ্মী আসুক। সন্ধ্যের পিদিম জ্বালুক তারা—শাঁখ বাজিয়ে বরণ করুক ঘরের লক্ষ্মীকে।'

কিন্তু কোথায় কার ঘরে শঙ্খধ্বনি! একটি সন্ধ্যের শাঁখও তো শোনা যায় না কারুর ঘরে! পান্তি অবাক। হ'ল কি সব!

তার বাপের মুখ গম্ভীর—চিন্তাকুটিল, কথা আজকাল প্রায় বলেই না সেই ঝগড়ার পর থেকে। কোন কিছু শুধাতেও ভরসা হয় না। কিছু বুঝতে পারে না পান্তি। শুধু তার মনে হয়—এই নীরব সন্ধ্যের অন্ধকারের আড়ালে ক্ষুধার্ত গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে কিছু যেন একটা ঘটে যাচ্ছে। অন্য দিন এমন সময়ে শঙ্খরোল প'ড়ে যেত। কিন্তু আজ থম্ থম্ ক'রছে সবটা—ঝড়ের আগে আকাশের মত। মনে পড়ল—ডোর-কাটা সার্ট গায়ে লোকটি আজ বলে গেছে, পুলিস আসবে দু'দিন বাদে। কে জানে, হবে হয়তো এ সেই ধান লুটের ব্যাপার। লুট করেছে—এখন বুঝুক ঠ্যালা।

পান্তি রাগ ক'রে সন্ধ্যের পিদিমটাকে দিলে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে। লক্ষ্মী-ছাড়া ঘরে টিম টিম ক'রে শুধু ওটা জ্বলে হবে কি!

মথুরা তাকিয়ে ছিল কটমট ক'রে—হুংকার দিয়ে উঠল, 'ওটা নেভালি যে! লক্ষ্মীছাড়ি বেসরম!'—

পান্তি দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে সামনে দিয়ে চলে গেল বেপরোয়া ভাবে।

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে মথুরার ঃ কি কুক্ষণে সে এই মেয়েটাকে ফিরিয়ে এনেছিল এবার—সুখে থাকবে বলে! হায় রে হায়!—কি দিনকাল, নিজের মেয়ার সহবৎ দেখ!

অনেক কটা বছর সে মনে পাষাণ দিয়ে পড়েছিল সাহুজীর কাছে তৃতীয় বার বেচে আসার পর। মেয়েটা ডাগর হয়ে উঠেছে দেখে সাহুজী একটু বেশী টাকাই দিয়েছিল তাকে আর সাদা কাগজে টিপ্-সই করিয়ে তবে ছেড়েছিল। ভড়কে গিয়ে মথুরা আর ওপাশ ঘেঁষেনি। মনে প্রবোধ দিয়েছিল—যাক, তার মেয়ে নেই—মরেই গেছে ধরো।

কিন্তু তার নিজেরই মরা মন বেঁচে উঠল যে! বাঁধ-ভাঙা কোন বেঁচে ওঠার বন্যা এলো গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মরা চাষীর ঘরে ঘরে—এক জোট হয়ে দখল নিল ধানের ক্ষেতে আর খামারে। এত জমি—এত ধান! হায় রে হায়—এমন দিনে শূন্য ঘরের দিকে চেয়ে বুকের ভেতরে নড়ে উঠল মেয়ের কথা। এত দিনে কত বড় হয়েছে মেয়েটা কে জানে!

ঘরে আর টিকতে পরল না মথুরা—চলল সেই সাহুজীর গদিতে। আশেপাশেই ঘুরল কদিন—কোথায় যে সাহুজীর জেনানা মহল—কে জানে। মেয়েটার পাত্তাই পাওয়া যায় না। ক'দিন ঘোরাঘুরির পর মথুরা মেয়ের দেখা পেল—পেছনের পুকুরঘাটে দুপুর বেলা এসেছিল এঁটো বাসন মাজতে।

মথুরা ঝোপের আড়াল থেকে ডাকল হাত নেড়ে—মেয়েটা ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল তো রইলই। তারপর বোধ হয় চিনতে পেরে কাছিয়ে এসেছিল ভয়ে ভয়ে। কাছে এসে ছলছলিয়ে উঠেছিল ওর চোখ। কিন্তু তার কাঁদবার আগেই মথুরা ফুঁপিয়ে উঠেছিল, 'ক্ষ্যামা দে মা—ক্ষ্যামা দে তোর গরীব বাপকে। আর নয়—অতি বড় দিব্যি গেলে বলছি আর নয়, ঘরে ঘুরে চল।'

মেয়েটা বলেছিল, 'সাহুজী কিছুদিন আগে বেচে দিয়েছে মোকে আর একটা খারাপ লোকের কাছে। সে নাকি বেশ্যার কারবার করে। ক'দিন বাদে নিয়ে চলে যাবে মোকে।'

'তবে!' মুখ শুকিয়ে গেছল মথুরার। বুকের ভেতরটা তোলপাড় ক'রে উঠেছিল আবার। 'তবে এখুনি পালিয়ে চল না। কেউ কোথাও নেই। ছুটতে পারবিনি—এঁ্যা! ওরে তুই না গেলে আমার ঘর যে হা-হা করবে।'

'তারপর আবার দুদিন বাদে তো তুমি বেচে দেবে মোকে!'

'ওরে আর না—আর না। তুই শুধু বেচাটাই দেখলি বেটি—ছুটে

ছুটে আসি কেন বুঝলি না রে! আর বেচবো না। বেচবো কেন? দেখবি চল গাঁয়ে, বেচার দুঃখ ঘুচে গেছে তোর ব্যাপের।'

কিন্তু কি ধাড়ি কালসাপ ঘুরিয়ে এনেছিল সে—হায় রে বাপ্!

অন্ধকার দাওয়ায় বসে বসে আজ আপসোস করে মথুরা।

শাঁখ বাজল সেদিন অনেক রাতে। শুধু একটি শাঁখ।

মথুরার তন্দ্রার মতো এসেছিল, শুয়ে পড়েছিল দাওয়ায়—উঠে পড়ল ধড়মড় করে। বেরিয়ে গেল দাওয়া থেকে—অন্ধকারে মিশে গেল চুপচাপ।

কোথায় গেল যেন। বাপের কাণ্ড উঁকি মেরে দেখল পান্তি। কৌতূহলে বেরিয়ে এল বাইরে। শাঁখের শব্দটা থেমে গেছে। পান্তি চেয়ে দেখল আকাশভরা তারার আলোয়—তার বাপ হন্ হন্ ক'রে চলে যাচ্ছে কোথায় যেন। আরও একটি মূর্তি। তার পেছনে আরও একটি। আরও। নিঃসাড়। কেউ কাউকে ডাকছে না।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? পান্তির মেয়েলী কৌতুহল ঠেলে উঠল। এক পা এক পা করে সে পেছু নিল ওদের। এসে ঠেকলো লখিন্দর মণ্ডলের ঝুপড়ি টঙের কাছে। পাশের একটা ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে লাগল —নিঃসাড়ে একে একে আরও এলো অনেকে। চেনা যায় না অন্ধকারে। এক সময়ে ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল কুঁড়ের বাঁশের দরোজাটা।

ছিটে বেড়ার ঘর। পান্তি কান খাতল গিয়ে দেওয়ালে। শোনা যায় মজলিশের চাপা চাপা কথা।

কে বলল, 'হারাধন এসেছিল নাকি?'

'তোমার বেটি বলেছে কারো নাম?' ভুতুর বুড়ো গলায় শঙ্কিত জিজ্ঞাসা। তারপরেই হাউমাউ করে ওঠে মথুরা, 'তার কথা শুধিয়োনি মোকে। সে মোর ব্যাটা নয়—বেটি, পরের ঘরে যাওয়ার জন্যে তার মন। ব্যাটা হলে বুঝতো—বাপের দুঃখ, গেরামের মাটির টান, বাপের ঘরের ব্যাথা।'—

কে বলল, 'কথায় বলে বেটি পর-ঘরী। খাচ্ছে দাচ্ছে পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি।'

এমন সময় খপ ক'রে কে চেপে ধরল পান্তিকে পেছন থেকে। ঝটকা মেরে সে ছুটে পালাতে চাইল—পারল না। ধস্তাধস্তি ক'রে তাকে ধরে নিয়ে গেল সেই কুঁড়ের ভেতর।

পান্তি আড়ি পেতে শুনতে আসবে এত রাতে—এতটা কেউ আশা করেনি। সবাই কাঠ।

মথুরা লজ্জায় অপমানে থর থর ক'রে। বসে থাকতে পারল না—উঠে দাঁড়াল উত্তেজনায়। ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি চেপে ধরল পান্তির।

'কালামুখী!'—

সবাই ধরে ফেলল মথুরাকে।

মথুরা পান্তিকে ছেড়ে দিয়ে কেঁদে উঠল আবার হাউমাউ ক'রে, 'ও কালামুখীর জন্যে মোকে দণ্ড দাও তোমরা—কি ওকে মেরে ফেলতে চাও, মেরে ফ্যাল। মোর দয়া নাই আর অর জন্যে। ও মোর কলঙ্ক—মোদের গেরামের কলঙ্ক।' বলে সে আর দাঁড়াতে পারল না—মজলিশ থেকে লজ্জায় অপমানে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে গ্রামেরই মানুষ সবাই—বুড়োরা আর জোয়ান ছোকরারা। কিন্তু কারুরি মুখের দিকে পান্তি চোখ তুলে তাকাতে পারল না। মুখে দু'হাত ঢেকে শুধু ফোঁপাতে লাগল।

একটি ছোকরা মতো চাষী জেরা করতে লাগল, 'এখানে কে আসতে বলেছে তোমাকে—এ্যাঁ? হারাধন?'

'না—না—না।' পান্তি সমানে ফোঁপাতে লাগল।

'মিছা কথা বোলোনি। হারাধন আজ এসেছিল—মোরা জানি।'

পান্তি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'সে বলে গেল—পুলিস আসবে দু'দিন বাদে।'—

কঠোর ক্ষুধার্ত মুখগুলি অন্ধকারে তাকাল পরস্পরের দিকে।

সেই ছোকরা চাষীটি আবার কথা বলল, 'তবে বুঝে দেখ—মোদের গুলী করবে, কি গারদ দেবে, কি করবে তার ঠিক নাই। কে মরবো, কে বাঁচবো জানি না। কার নাম বলবে তুমি মথুরা দাসের ঝি? সবাই মোরা পেটের জ্বালায় জ্বলে বাঁচতে চেয়েছিলাম। তোমার বাপ দেখছিল এবার গোলা-ভরা ধানের স্বপন। ভরসা ক'রে তাই তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল সাহু খোট্টার বাড়ী থেকে—এবার সুখে থাকবে বেটিকে নিয়ে।'

পান্তি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তোমরা পালাও এ গেরাম ছেড়ে।'

'কোথায় যাব বলতে পার!' কৌতুক ক'রে যেন বলল সে, 'কোন গেরামে গেলে মোদের পেটের জ্বালা মিটবে! কোন গেরামে গেলে বোন-বেটিকে বাঁচাতে পারবো—তোমার বাপের মতো আর বেচতে ছুটবো না! আর, আর কোথায়ই বা যাবো এ গেরাম—সাত পুরুষের এ জন্মের ভিটা ফেলে বল তো?'

পান্তি বলল খোঁচা খাওয়া কথার যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে, 'মোকে ছেড়ে দাও।'

'যাও—তোমাকে কেউ ধরে রাখবেনি। তুমি এ গেরামের বেটি, তোমার সঙ্গে মোদের বিরোধ নাই কোনো। চল—অন্ধকার রাত, সঙ্গে যাই।' এগিয়ে দেওয়ার জন্য উঠল সেই ছোকরা চাষীটি।

তার আগেই পান্তি তেমনি হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার সময় বলে গেল শুধু, 'তোমরা পালাও।'

ছুটে সে বেরিয়ে এল বটে ঘর থেকে কিন্তু কিছুটা এসে থমকে দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানে। কেমন ভয় করতে লাগল তার।

কিছুক্ষণ পরে সেই ছোকরা চাষীটি তাকে অনুসরণ ক'রে এসে দাঁড়াল সামনে। হেসে বললে, 'ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে মথুর দাসের ঝি?'

পান্তি কেঁদে ফেলে বললে, 'নিষ্ঠুর বাপ মোর আজ মেরে ফেলবে ঘরে গেলে।'

'মারবে কেন! সে মোরা বলে দেব।' সে হেসে বললে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে মোরা হাত তুলি না। চল।'—

মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারে সেই ছোকরা চাষীর মুখে কি দেখল কি জানি পান্তি, বোকার মতো চেয়ে রইল তো রইলই।

দু'দিন পরের কথা। ভোর রাত্রে পান্তির ঘুম ভাঙল একটানা এক শঙ্খরোলে। শঙ্খধ্বনির এ ঠারঠোর সে বোঝে না। তাকে কেউ বলেওনি। গ্রামের অন্য মেয়েরা জানলেও তাকে সবাই এড়িয়ে গেছে। সে যেন এ গাঁয়ের শত্রু। তাই শাঁখের শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে, মনে হল তার—বোধ হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। ভূমিকম্প হলে তো শাঁখ বাজান নিয়ম। তবে? দাওয়ায় বেরিয়ে এল বাপের খোঁজে। কিন্তু কোথায় তার বাপ! দাওয়ার এক কোণে পাতা বিছানাটা খালি। হঠাৎ কেমন একটা অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল তার।

গ্রামময় তখন শঙ্খরোল। সে-ও শাঁখ তুলে নিল হাতে। ফুঃ দিলে। একসময়ে আস্তে আস্তে চারিদিক থেকে থিতিয়ে এল শাঁখের শব্দ। গ্রাম প্রান্তর পরিব্যাপ্ত ফিকে অন্ধকারে শব্দহীন এক শূন্যতায় কিছুক্ষণ আগের উচ্চকিত গ্রামটা যেন আবার আস্তে আস্তে মরে গেল। পান্তি অসহায়ের মতো চেয়ে রইল দুর্জ্ঞেয় অন্ধকারের দিকে। কেমন ভয় করে হঠাৎ তার। বাপ নেই ঘরে। কোথায় চলে গেল তাকে ফেলে!

কিছুক্ষণ বাদে বন্দুকধারী পুলিস বাহিনী আর জমিদারের পাইক লাঠিয়ালে ঘিরে ফেলল সারা গ্রামটা। বুনো শুয়োর তাড়া করার মতো

গ্রামের বন-বাদাড় ভেঙে, কিসান পাড়ার কুঁড়েগুলো ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হতাশ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত—একটাও মর্‌দ নেই। আছে শুধু মেয়েলোক আর কাচ্চাবাচ্চা। ধমকাধমকি করলে জবাব সকলের এক ঃ

'টানের দিন—মরদরা সব মাটির কাজ করতে চলে গেছে।'

'টানের দিন!' দারোগা সাহেব দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, 'আর লুটের ধান? বার কর মাগী।'—

'হায় গো বাবু, পেটে দানা নাই—ধান কুথা!'—

'মাটির নীচে পুঁতেছে কোথায় শালারা—খোঁড় মেঝে।'

কিছু নেই—কোথাও কিছু নেই! মায় মাটি খোঁড়ার কোদালটি পর্যন্ত। হতাশায় আক্রোশে আরও ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। লণ্ডভণ্ড হতে থাকে কুঁড়েগুলো—কে কোথায় আর্তনাদ করে যেন। বড় কাঁচ গলা।

দাওয়ার খুঁটি ধরে কাঠ হয়ে শুনছে পান্তি।

এমন সময় হারাধন এল। তার পেছনে পেছনে ফৌজ লাঠিয়াল। দারোগা জিজ্ঞেস করল ঃ

'তুমি বাছা মথুরা দাসের মেয়ে?'

গলা যেন গলে পড়ছে মোমের মতো। কিন্তু পান্তি দাঁড়িয়ে আছে একভাবে। কাছ ঘেঁষে হারাধন দাঁড়িয়েছিল পান্তির—খোঁচা দিয়ে বলল, 'বল না।'

পান্তি নিরুত্তর।

হারাধনই বলল অগত্যা, 'হাঁ হুজুর।'

দারোগা আবার জিজ্ঞেস করল নরম গলায়, 'গাঁয়ের সব পুরুষরা কোথায় লুকিয়েছে বল তো বাছা।'

তবু চুপ ক'রে আছে পান্তি। হারাধন অধৈর্য হয়ে চাপা গলায় বলল চোখের ইসারা ক'রে, 'বলে দে না চটপট।'

পান্তি তবু কথা বলে না।

দারোগা ঠোঁট কামড়াল একবার। তারপর আবার বলল মোলায়েম করে, 'ভয় নেই তোমার মেয়ে। বল। আচ্ছা সকলের কথা না হয় থাক, ধান লুট করবার জন্যে উসকে ছিল কে কে বল তো!'

'বলে দে না নাম কটা।' হারাধন ফিস ফিস ক'রে বলল অসহিষ্ণু হয়ে 'দিয়ে চল মোরা চলে যাই। শুনচিস?—পান্তি!'—বলে সে পান্তির একটা হাত ধরে একটু চাপ দিলে।

বাপ বলেছিল তার—'সে মোর ব্যাটা নয়—বেটি'—কথাটা ঝিকিয়ে ওঠে এই সময়ে পান্তির মনে। ঝিকিয়ে ওঠে মুহূর্তে আরও বহুদিনের কথা।...

কে একটা লোক সেই এক ডাক্তারের বাড়ী থেকে তাকে ছোঁ-মেরে বুকে তুলে নিয়ে ছুট দিল গ্রামের দিকে। ভয়ে সে কেঁদে উঠেছিল প্রায়। লোকটা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ছুটতে লাগল তো লাগলই। একটা ফাঁকা জনশূন্য জায়গায় কোল থেকে তাকে নামিয়ে বলেছিল :

'আমি তোর বাপ। বড় দুর্দিনে তোকে বেচেছিলম মা। ঘুরৎ চাইলে পাছে না দেয়—তাই—'

সেই বাপ আবার তাকে সাহুজীর বাড়ী থেকে চুরি ক'রে আনবার সময় কেঁদে উঠে বলেছিল না?—বলেছিল, 'শুধু বেচাটাই দেখলি মা—ছুটে ছুটে আসি কেন বুঝলি না রে! ··· দেখবি চল গাঁয়ে, বেচার দুঃখ ঘুচে গেছে তোর বাপের।'

আর সেই ছোকরা চাষীটি—কি বলেছিল তাকে যেন সেদিন রাতের বেলা—কি বলেছিল যেন বুঝিয়ে বুঝিয়ে অনেক কথা? গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেমন সব। ঠোঁট কাপছে পান্তির।

'বল মা বল।' দারোগা জিজ্ঞেস করল আবার।

হারাধন বলল হাতে আবার একটা চাপ দিয়ে, 'বলে দে না।'

'ছেড়ে দাও—হাত ছেড়ে দাও বলছি মোর।' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল পান্তি, 'খবর্দার—গায়ে হাত দিবে না বলছি মোর।'

দারোগা ঠোঁট কামড়াল আবার। পাশে দাঁড়িয়েছিল জমিদারের টেকো গোমস্তা একজন। তাকে চোখ ঠেরে চাপা গলায় বলল, 'এখানে হবে না। নিয়ে চল। একটু বাঁকাতে হবে।'

গোমস্তার চোখের ইসারায় ক'জন পাইক চেপে ধরল গিয়ে পান্তিকে—হেঁচকা টান মেরে বলল, 'চল হারামজাদী—হারাধনের সঙ্গে তোর সাদি হবে।'

গাঁয়ের সবাই ভাবল—হয়ত বিয়ে-সাদি হয়েই গেল পান্তির। দু'দিন—তিন দিন কেটে গেল, কোন লক্ষণ নেই ফিরে আসার। হয়তো নাম বলে দিয়েছে সে সকলের—মায় তার বাপের নামটি পর্যন্ত। এবারে হুলিয়া আসবে একেবারে।

কিন্তু হুলিয়া এল না কারোর নামে—এল পান্তি। কে একটা ভূতের মতো নিশাচর লোক অন্ধকারে লালগঞ্জের ভেড়ি-বাঁধের উপর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল তিন দিন পরে গ্রাম সীমান্তের খালের সাঁকোর কাছে। গোরু ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ক'রে বাঁশে হাত-পা বেঁধে সাঁকোর ধারে ফেলে গেছে পান্তিকে। সে কারুর নাম বলেছিল কি-না কে জানে, তবে

জিভটা তার মুখের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে এক পাশ দিয়ে, বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে না চোখের ডিমটা বেরিয়ে পড়েছে ঠেলে তা অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই, ফুলে ফেঁপে গোদা হয়ে গেছে পা দুটো—হয়ত ঝুলিয়ে রেখেছিল কোথাও। বাঁশ থেকে তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে ভূতের মতো সেই লোকটা দাঁড় করাতে গেছল পান্তিকে—দুম ক'রে সে পড়ে গেল উল্টে। তবু প্রাণ ছিল—কারণ ককিয়ে উঠেছিল যেন। ঝিমানো ডান চোখটায় সমস্ত শক্তি দিয়ে পরম আগ্রহে চেয়ে দেখেছিল—লোকটা কি তার বাপ, না সেই ছোকরা চাষীটি—যে একদিন রাতে তাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল !—চিনতে পারল না।

ঘরের ঠিকানা ॥ ১৯৫৩

আত্মা

দলের রাতকানা লোকটা জিজ্ঞেস করলে, 'আর কত্‌টা পথ হে ?'

'হেঃ—রাত দু-পহর তক্‌ হাঁট শালা এখন—তারপর হাট-চালায় যেয়ে মাথা গুঁজবি।' পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি বললে, 'হাঁট এখন মুখ বুজে।'

কিন্তু মুখ বুজে থাকা তার পক্ষে কঠিন—হোঁচট খাচ্ছে সে পায় পায়, যদিও হাত ধরে চলেছে একজনের। বকে মরছে বিড় বিড় ক'রে। দলের আর সবাই চুপ। মাথায় কাঁধে মোট—পিঠে বোঁচকা, কোন মেয়ের বোঁচকায় ঘুমন্ত শিশু। দলটিতে প্রায় মেয়ে মরদ ক'রে জনা দশেক হবে—চলেছে কোন নতুন হাট-খোলার উদ্দেশে পুরান কোন হাট-খোলা ছেড়ে। মাথায় পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে ঘর-সংসার—হাঁড়িকুড়ি কাঁথা চ্যাটাই—মায় টঙ বাঁধার বাঁশ-বাখারিটি পর্যন্ত।

জাতে ওদের বলে 'কাক-মারা'—কোন্‌ বুনো পূজোর পদ্ধতিতে কাক ধরে ধরে বলি দেয়, কাকের মাংস খায় পরম তৃপ্তিতে। ব্যাধের মতো পাখী শিকার করে—হয়তো বুনো পাখী সব সময় সহজলভ্য নয় বলে সুপ্রচুর কাককুল ওদের পরম ভোজ্য। বেদের মতো ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মাথা গোঁজে হাট-চালার আশেপাশে। গলায় লাল নীল কাঁচের মালা। পুরুষেরা পাখী শিকার করে, ভেল্কি ভোজবাজী দেখায়, আর তেড়ে নেশা করে গাঁজাগুলির। মেয়েরা ঝুড়িতে ক'রে বেচতে নিয়ে আসে সস্তা দামের সাবান তেল আয়না ইত্যাদি। গ্রামের গেরস্থ মেয়ে-ভোলানো শৌখীন টুকিটাকি জিনিস, আর নবীন যুবক চাষী ছোকরাদের টান মারে কখনো বা চোখ ঘুরিয়ে। জীবিকার পক্ষে উপযোগী হলে নিজেরা টঙ বাঁধে হাট-খোলার আশেপাশে যতোখানি আগ্রহে, ঠিক ততোখানি ঔদাসীন্যেই আবার হুট ক'রে চলে যায় কবে সব ভেঙে দিয়ে। মাতৃভাষা তেলেগু—কিন্তু দিব্যি কথা বলতে পারে স্থানীয় ভাষায়। কবে ওরা মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কে

জানে—দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দক্ষিন-পশ্চিম বাঙলার সীমান্তের অঞ্চল থেকে অঞ্চলে।

দলের রাতকানা লোকটা পড়ে গেল দড়াম ক'রে একেবারে হুমড়ি খেয়ে।

পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি গালাগাল দিয়ে বলে উঠল, 'শালা গোব্‌না সাঁঝ-পহর থেকে দড়াম দড়াম ক'রে পড়তে লেগেছে গো।'

শুধু পড়া নয়—এবার গোবনা পড়ে আর উঠছেও না। যার হাত ধরে ধরে যাচ্ছিল সে বলে উঠল, 'উঠছে না যে গো!'

'মরেছে!'

দল দাঁড়াল থমকে।

শীতের রাত। চাঁদের আলো নেই। কুয়াশায় সবটা আচ্ছন্ন।

বাগাম্বর বুড়ো ঘোলাটে চোখ তুলে চারদিকে চেয়ে বললে, 'কত্‌ খানি এলম বল দেখি?'

কে একজন বললে, 'নদীচরের জালপাই মহাল এলাকা এখনও ছাড়াতে পারিনি হে।'

'তবে!'

রাতকানা গোবনা ততক্ষণে উঠেছে কঁাতিয়ে কঁাতিয়ে। বলল, 'পা দুটা মোর বশ থাকছে না কোনো মতে।'—

পাশের জোয়ান ছোকরাটি খেঁকরে উঠে বললে, 'তবু বলবে না শালা—চোখে দেখতে পায় না।'

বাগাম্বর বললে, 'এক কাজ করা যাক এসো।'

দলের বুড়ো লোকটির কথা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠল সবাই।

বাগাম্বর বললে, 'মোদের এক বেটির ঘর এইখেনে—আজ রাতটা থাকি চল সেখেনে যেয়ে।'

'মোদের বেটি?'—

'হাঁ গো—মোদের জাতের মেয়া। দল ছেড়ে চলে গেল একদিন সে একটা উদো চাষীর সঙ্গে। তার ঘর এই জালপাই মহালে।' বাগাম্বর বললে, 'জমিন গোরু ছাগল হাঁস মুরগী—ঘরদোর সব জম্‌জমাট। মেয়াটা মোদের ভারী পয়মন্ত কি-না।'

'কে বল দিকিন।'

'আন্দি। মোর এক স্যাঙাতের বেটি। চিনবেনি তোমরা।'

'কিন্তু তোমাকে সে চিনবে তো?'

'চিনবেনি! বল কি!' বাগাম্বর এক গাল হেসে বললে, 'মোরা যাই

না বলে কত গোসা করে বেটি মোদের। গেলে খাতির করবে কত! আর তার অভাবই বা কি বল। গোলায় ধান, গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ।'

ভূতের মতো লোকগুলোর জিভের তলায় জল এসে গেছে ততোক্ষণে, একসঙ্গে প্রায় বলে উঠল সবাই, 'চল তবে।'

দলটি মোড় ফিরল উত্তর থেকে পূবে।

রাতকানা গোব্‌না ঝপ্‌ ঝপ্‌ ক'রে চলতে চলতে বলল, 'মোদের জন্যে তা হলে মাছটাছ ধরবে—কি বল ?'

বাগাম্বর বুড়ো বললে, 'অত রাতে মাছ কি আর ধরবে! তবে হাঁস মুরগী একটা কিছু মারতে পারে।'

মাছ নয়—একেবারে মাংস! কাক খাওয়া তিতকুটে মুখগুলো এক লহমায় যেন সজল হয়ে উঠল স্বাদে আর গন্ধে। দলের বুড়ো বাগাম্বরের পেছনে পেছনে চলেছে ওরা—হাঁটার গতি গেছে বেড়ে—মায় গোবনার পর্যন্ত।

দলের সামনের একজন বলে উঠল, 'নতুন হাঁড়ি পড়েছে গো দাদা।'

বাগাম্বর শুধাল, 'শ্মশান ?'

'তাই তো দেখি।'

বাগাম্বর বললে, 'এসে পড়েছি তা হলে। শ্মশান পার হয়ে বাঁয়ে বেঁকবে।'

আগের লোকটার চোখ তখনো শ্মশানের মড়াফেলা হাঁড়ির দিকে। বললে, 'অনেক হাঁড়ি গো।'

রাতকানা গোবনা বললে, 'মোর ভাতের হাঁড়ি নাই—একটা বেছে তুলে দে না ভাই হাতে।'

বাগাম্বর বললে, 'সে সব সকালে হবে। এ মস্ত শ্মশান—অনেক হাঁড়ি পাবে, মনের সুখে তখন বাছবে। চল এখন।'

দু-একজন তবু হাঁড়ির লোভ ছাড়তে পারে না—হাতে তুলে নেয় দু-একটা। ঠন্‌ ঠন্‌ ক'রে বাজিয়ে দেখে কানের কাছে—ভালই আছে। শ্মশানের মড়া ফেলা হাঁড়ি কলসীর জন্যে ওদের ঘৃণাও নেই—ভয় সংকোচও নেই। তাইতে গুষ্টিশুদ্ধ রাঁধে-বাড়ে খায় আর গাছ তলায় শোয়। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তল্লাট থেকে তল্লাটে। মরে আর জন্মায় বংশপরম্পরায়। এই ওদের জীবন।···

এর মধ্যে ব্যতিক্রম যেন আন্দি—উদো চাষী জগার বিধবা। তিনটে নাবালক ছেলে রেখে সাপ-কাটিতে জগা মরে গেছে। কিন্তু তার জমিজিরেত

ঘর-সংসার অটুট আছে আন্দির কাছে। বলদ হাঁকিয়ে নিজেই সে চাষ-আবাদ করে একটা জোয়ান মরদের মতো। তিন ছেলের মা কিন্তু এখনও সে ভরাযৌবনা, বেদের মেয়ের নির্ভীকতার সঙ্গে মিশেছে কিসান বউয়ের লক্ষ্মীশ্রী। ঝকঝক তক্‌তক্‌ করছে ঘরদোর উঠোন দাওয়া।

বাগাম্বরের বুনো 'কাক-মারার' দল সেই উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ-করে চেয়ে রইল।

বাগাম্বর গলা ফুলিয়ে বললে, 'এই মোদের বেটি-জামায়ের ঘর। দেখ।'

হঠাৎ অন্ধকারে অতগুলো মানুষের কলকলানি শুনে আন্দি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথাকার লোক বটে গো?'

বাগাম্বর এগিয়ে গিয়ে এক গাল হেসে বললে, 'এলম গো বেটি। কতদিন ভেবেছি আসব আসব—তা আর হয় না। আজ ভাবলম—যাই একবার ঘুরে মোদের বেটি-জামায়ের ঘর। কতদিন যে দেখিনি বেটি তোকে।' বাগাম্বরের গলাটা নরম হয়ে এল দরদে।

কিন্তু বেটির মুখের তখন দ্রুত ভাবান্তর ঘটছে! বাগাম্বরের মাথায় গোঁজা কাকের পালক আর গলায় লাল-নীল কাচের মালা দেখেই বুঝেছে আন্দি—উঠোনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কারা! সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পড়ল তার জঞ্জাল সাফ-করা ঝাড়ুর।

'যতো বেহায়া নাক-কাটা, ভাগাড়ের হারাম—ঝেঁটিয়ে সাফ করবো আজ। এত দূর দূর করি—তবু লাজসরম নাই!'—

এক লহমায় বুঝে নিল বাগাম্বর—আগেও তা হলে বহু দল তাড়া খেয়ে গেছে। তার নিজের ইজ্জৎ যায় যায় প্রায় তার দলের কাছে। বাগাম্বর হাসি মুখে তবু বলল, 'মোরা তো কখনো আসিনি বেটি।'

'ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে!' আন্দি এবার ঝাড়ু ছেড়ে বঁটির খোঁজ করলে।

অন্ধকার উঠোনে অপেক্ষমান দলটির মধ্যে এবার চাঞ্চল্য দেখা গেল।

বাগাম্বর মোলায়েম ক'রে বললে, 'মোরা শুধু রাতটা থাকবো একটুন মাথা গুঁজে বেটি—কাছাকাছি কোন হাট-খোলা নাই যে থাকি। আর এই জাড়ের দিন!—কাল সকালে উঠেই চলে যাব মোরা।'

'যাবে—নড়বে তোমরা ভাগাড়ের শকুন!' আন্দি সমানে গাল পাড়তে লাগল, 'যত বেহায়া পাত-চাটা কুত্তা।'

বাগাম্বর বললে, 'বেশ—সকালে উঠে না চলে গেলে তখন বলিস। মানে

একটা রাতকানা আছে মোদের দলে—বেচারা পড়ে যাচ্ছে শুধু দড়াম দড়াম ক'রে। একটা রাত শুধু বেটি !'—

আন্দি বোধ হয় একটু নরম হল। তবু গর্‌গর্‌ করতে করতে বললে, 'অত গুলান লোকের মুখে দেব কি ছাই। কোথায় পাব এত রাতে হাঁড়ি-কড়াই।'

কথার ধারা বদলেছে দেখে দলের মধ্যে হঠাৎ একটা আশার সঞ্চার হল যেন। গোব্‌না বলে উঠল, 'হাঁড়ির অভাব কি গো। হেই তো পাশের শ্মশানে কত বড় বড় হাঁড়ি সব গড়াগড়ি যাচ্ছে।'—

আর যাবে কোথায়। যুগপৎ ঝাড়ু বঁটি কাটারি ইত্যাদির ঘন ঘন উল্লেখ ও হুহুংকার একযোগে আন্দিকে উত্তাল ক'রে তুললে। তাকে আর নরম করতে পারে না কোন রকমে বাগাম্বর। সত্যি সত্যি আন্দি হাতে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র মূর্তিতে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে সে—শ্মশানের হাঁড়ি-নাড়া এ ভূতের দলকে আশ্রয় দিয়ে কেমন ক'রে সে অকল্যাণ ডেকে আনে !

চতুর বাগাম্বর আন্দির সুরে সুর মিলিয়ে গাল পাড়তে লাগল গোব্‌নাকে, 'তাড়িয়ে দে শালা কানাকে। বেটির মান রাখতে জানে না শালা ছোটলোক।'

শেষ পর্যন্ত রফা হল—আন্দির দাওয়ায় পড়ে থাকবে ওরা একটা রাত। ভাতটাত হবে না, মুড়ি পাবে সবাই চাট্টি চাট্টি। রাত থাকতে থাকতে পালাতে পাবে না কেউ—যাওয়ার সময় ঝোলাঝুলি সব খুলে দেখিয়ে যেতে হবে আন্দিকে। হাঁস মুরগীর একটা কোন কিছুতে হাত দেবে তো বেধড়ক্কা ঝাঁটা খাবে সবাই।

মাথা দুলিয়ে তাতেই সায় দিলে বাগাম্বর। তারপর একগাল হেসে হাত বাড়াল আন্দির বছর তিনেকের ছোট ছেলেটার দিকে, 'এসো দা-দা।'

'ওরে আমার চোদ্দ পুরুষের দাদারে !' আন্দি খেঁকরে উঠল। 'খবদ্দার —ছোঁবে না বলছি, খবদ্দার। কোন অজায়গা কুজায়গা থেকে এলে তার ঠিক নাই।' ছেলে তিনটেকে টেনে নিয়ে রাগে গর্‌ গর্‌ করতে করতে ঘরে ঢুকে গেল।

আন্দির মেজছেলেটার বয়স হবে বছর ছয়েক। সবটা বুঝুক না বুঝুক—কৌতূহল তার সব দিকে। মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে রাত্তিরে সে জিজ্ঞেস করলে, 'ওরা সব কারা এসেছে আম্মা ?'

বড় ছেলে ভুটে একটু বেশী সেয়ানা—বয়স তার বছর দশেক। সে বললে, 'ওরা সব মামা—সেই যে'আগে এসেছিল আরো !'—

মেজাজ চড়ে আছে আন্দির নানান ঝঞ্ঝাটে। ভুটের ওপরে খেঁকরে উঠে বললে, 'ফের যদি মামা বলবি তো কেটে ফেলাব।'

আন্দি বলে কেউ ছিল কোনদিন এই ভবঘুরে কাকমারার দলে—সে কথা ভুলতে চায় সে। চাষীর বউ সে এখন—ঘরগেরস্থালী নিয়ে ছেলেপুলের মা। কিসান-জননী।

ভুটে কিন্তু ফের জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা আম্মা—মোদের ঘরে কোন কুটুম তো আসে না !'

'কুটুম এসে একেবারে রাজ্যি দেবে! নাই বা এল,—মোদের কি চলছে না !'

মায়ের মেজাজ দেখে ভুটে থামল।

আন্দি একটু থেমে বললে, 'আছে—তোর কাকারা আছে, জ্যাঠারা আছে, হোই উত্তর দেশে সে এক গাঁয়ে।' অর্থাৎ স্বামীর সম্পর্কিত চাষী গেরস্থরা সব। একটু দম নিয়ে আন্দি আবার বললে, 'কত জমি জায়গা, গোরু বাছুর তাদের সব—গোলায় ধান, পুকুরে মাছ।'

কাকমারা বেদিনীর মনে গজিয়েছে শেকড়—একদিকে আঁকড়ে ধরেছে পৃথিবীর মাটি আর একদিকে পল্লবিত হয়ে উঠেছে ঘরে গেরস্থালীতে পুষ্পিত মেহগনি গাছের মত।

ভুটে বললে, 'আমরা তবে যাই না কেন কাকাদের কাছে ?'

'না—আমরাও যাই না, তারাও আসে না। আসবে কেন তারা ? সে যে চলে এল একদিন সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে।'

'কে আম্মা ?'

'কে আবার—তোদের বাপ। তোরা তখন জন্মাসনি।'

তখন সবে রঙ লেগেছে বাইশ বছরের জোয়ান চাষী জগার চোখে—ঘুর-ঘুর করে সারা দিনরাত গাঁয়ের হাটচালার ধারে কাকমারার ঝুপড়ি টঙগুলোর আশেপাশে। নবযৌবনের মোহ—আন্দিকে ঘিরে তখন তার অনাস্বাদিত আনন্দের স্বর্গ। তার জাতের শাসন আর গাঁয়ের বাঁধন ··· কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারলে না তাকে শেষ পর্যন্ত। কি ছিল শ্যামলা মেয়েটার চিকন মুখে চোখে—একদিন বাউরা হয়ে বেরিয়ে গেল সে ওই ভবঘুরের দলের সঙ্গে। ঘুরে বেড়াল কতদিন গাছতলায় গাছতলায়—হাটচালায়-চালায়। দিনগুলো ভাসে আন্দি বেওয়ার চোখে। ভালবাসার জাতবর্ণ নেই। এই

মেয়েটার চোখ ছল ছল করে অন্ধকারে সেই একটা লোকের জন্যে—যে নোঙর ছেঁড়া জীবনে তাকে দিল স্বস্তির স্বাদ, শান্তির স্বাদ—রঙের মাতলামীই শুধু নয়।

চাষীর রক্তে আছে ঘরের টান—মাটির টান। একদিন তাই জগা বললে, 'আয় ঘর বাঁধি—চাষ-আবাদ করি। অতো ঘুরে মরতে কি ভালো লাগে!'

কিন্তু কাকমারার মেয়েকে বউ ক'রে কোন গাঁয়ে সে বাস করবে চাষীর মতো! তার সমাজ তাকে বেইজ্জৎ করবে পদে পদে। ঘুরে ঘুরে এসে পড়ল সে এই চরে। এ চর তখন সবে হাঁসিল হচ্ছে। সে হল 'মুড়াকাটি' প্রজা—অর্থাৎ বনবাদা কেটে যারা আবাদ ক'রে প্রথমে এসে—ঘর বাঁধে।

বানভাসি বেদেনীর লাগল নতুন নেশা—জমির নেশা, ঘরের নেশা। স্বামীর সঙ্গে মিলে যতটা পারলে আবাদ করলে দু-হাতে। তারপর সে হল জননী—জন্ম দিল এ চরের নতুন তিনটি প্রজার, বাদা হাঁসিল করা জমির উত্তরাধিকার। স্বামী তার বাঁধ বাঁধল, ফসল ফলাল, ঘর গড়ল এ চরে।

ভুটে বললে, 'শুধু তুই আর বাবা গোটা চর আবাদ করলি?'

'না—আরও লোক ছিল। কিন্তু তোর বাপের মতো চাষী ছিল কে! কে ছিল অমন জোয়ান মরদ—শক্ত কাজের লোক!' বেদিনীর মুগ্ধ নারী সত্তা এই নগণ্য চাষীর কুঁড়ের অন্ধকারকে মুহূর্তে যেন মুখর ক'রে তোলে। এই অবোধ শিশুগুলো বাপের কথা শুধু শোনেই—বোঝে না মায়ের উত্তেজনা, তার সহসা চকিত ভাবান্তর।

ছেলেগুলো ঘুমিয়ে পড়ল একে একে। বাইরে কাকমারার দলও নীরব নিঃসাড় হয়ে গেছে। আন্দি জেগে রইলো উৎকর্ণ হয়ে। একটি লোকের প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। আর ছটফট করতে লাগল মনে মনে।

মাগন মণ্ডল এল অনেক রাত ক'রে। তার কাশির শব্দ শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল আন্দি। দরজা খুলে দিল।

মাগন বললে, 'হল না কিছুই—শালা তশীলদার জরিপ-সাহেবকে একেবারে হাত করে ফেলেছে, মায় আমিন পর্যন্ত।'

আন্দি প্রায় দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'জরিপ সাহেব কি বলে?'

'বলবে আর কি—যা করবার তাই করলে।' মাগন বলল, 'জগার সব জমি—মায় ভিটে পর্যন্ত খাস হয়ে গেল জমিদারের নামে। জগার কোনো ওয়ারিশ নাই—এই কথা মেনে নিল জরিপ সাহেব।'

'আর এই তিন-তিনটা ব্যাটা, আমি !' আন্দি দাঁতে দাঁত চেপে বললে।
'সব কথাই আমি বলেছি আন্দি।'
'বলেছ সব ? বলেছ, কেমন ক'রে আবাদ করেছিলম এ চর, কেমন ক'রে গতর দিয়ে করেছিলম একে সোনার মাটি। বলেছ ?—মোর মনে হয়, বুঝিয়ে বলতে পারোনি সব।'
'মোকে শুধু অবিশ্বাস করবি আন্দি চিরকাল ?'
আন্দি বললে, 'আমি আর কারোকে বিশ্বাস করি না। এই তিন-তিনটা ব্যাটা, তার বাপের কেউ নয়—এই কথাটাই সত্যি বলে দাগা হয়ে যাবে সরকারী কাগজে ?'
'আহা—বুঝলি না ? এ শালা সেই গোবিন্দ তশীলদারের কারসাজি আর মালিকের ঘুষের জোর। আমি কি আর বলতে কিছু বাকি রেখেছি !'
'তবে ?' আন্দি জ্বলে উঠে বললে, 'ভিটে ছাড়া করবে বলে তশীলদার হুমকি দেখায় মোকে,—কেড়ে লেবে মোর ব্যাটার হক পাওনার জমি !—বলেছ সব ?'
'আহা—সে সব কি আর বলিনি !'
'কে জানে—বলেছ কি-না।' আন্দি গর্ গর্ ক'রে বললে, 'মোর ব্যাটাদের জমির ওপরে সব ঢ্যামনার লোভ—মালিক পর্যন্ত। বিশ্বাস করি কাকে !'
হঠাৎ এ কথায় মাগনের মুখটা শুকিয়ে আমশি হয়ে গেল একেবারে। অন্ধকারে দেখতে পেল না আন্দি—দেখতে পেলে হয়তো থমকে যেত। সে এক পুরানো কথা—হিয়ের কথা মাগনের। ঠিক ওই ভাষায় অমনি ক'রেই আন্দি জবাব দিয়েছিল আরও একদিন—জগার মরার পর মাগন যেদিন একসঙ্গে ঘর বাঁধার প্রস্তাব করেছিল। একেবারে নিঃসঙ্গ টিংটিংয়ে এই লোকটার হিয়ের কথা যেন দাগই কাটেনি এই যুবতীর মনে। এক হাতের ঝাঁটা দেখিয়ে চরের চ্যাংড়া ইল্লুতে মরদগুলোকে যেমন দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তফাতে—তেমনি হাঁকড়ে দিয়েছিল মাগনকেও।
আজও সেই মহাস্ত্রটার উল্লেখ ক'রে ফের বললে আন্দি, 'ঝাঁটা মারি ওই ঢ্যামনা গোবিন্দর মুখে।'
মাগন বললে, 'তা মারিস তাকে একশোবার। কিন্তু আমি তোর কি করলম আন্দি ! তোর ব্যাটার জমির জন্যে, ভিটের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাঠে-ঘাটে, আমিনের কাছে, জরিপ হাকিমের কাছে।'—
কথাটা মিথ্যে নয়। আন্দি চুপ ক'রে রইল।

মাগন বললে—যেন কিছুটা অভিমানে, 'যা ভাবিস তোর ইচ্ছে। কাল হয়তো জরিপ হাকিম তোকে ডেকে শুন্‌বে তোর কথা। আজ অনেক বলে কয়ে সেই বিচার চেয়ে এসেছি।'

মাগন চলে গেল। বাকী রাতটা কাটল আন্দির ছটফটিয়ে—কাল কখন যাবে সে জরিপ-হাকিমের কাছে।

রাত থাকতে থাকতে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখল—বাগাম্বরের দল তল্পিতল্পা বেঁধে বসেছে, এবার যাবে। ওদের দেখে খেঁকরে উঠে আন্দি বললে, 'ঝোলাঝুলি না দেখিয়ে যাচ্ছ যে বড় সব!'

হকচকিয়ে তাকাল সবাই। দেখতে দেখতে বিভ্রাট বেধে গেল একটা। এর ওর ঝোলাঝুলি থেকে কক্ কক্ ক'রে উড়ে বেরিয়ে এল মুরগীর বাচ্চা, কার কাপড়ের তলা থেকে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে উঠল ধাড়ি হাঁস। গোব্‌না বিপদ বুঝে ঝোলা চেপে বসে পড়ল মাটিতে—মড় মড় করে ভেঙে গেল ডিমের কাঁড়ি, উঠোন ভেসে গেল ভাঙা ডিমের কুসুমে। রাত-কানা বেচারী অন্ধকারে হাঁস মুরগী ধরতে পারেনি—হাতড়ে কিছু ডিম সটকেছিল ঝোলায়। কাঠ মেরে দাঁড়াল বুড়ো বাগাম্বর। আন্দির হাতে ঘন ঘন ঝাঁটার আস্ফালন।

মুখ বুজে অনেক গালাগালি হজম ক'রে, নাকে খৎ দিয়ে বাগাম্বরের দল যখন ছাড়া পেল তখন সূর্য উঠেছে আকাশে।

বাগাম্বর বললে, 'কাজটা খুব খারাপ করেছ সবাই। বেটির কাছে মোদের ইজ্জত রইল না।'

দল নীরব। তাদের বলার কিছু নেই। নীরবে চলেছে মাথা নীচু ক'রে।

বাগাম্বর বললে ফের, 'তোমরা হয়তো ভেবেছিলে—বেটি মোদের বোকা হাবা মেয়া কিন্তু দেখলে তো।'—

সে যে কি দেখা—সকলেরই মুখে চোখে তা একেবারে দাগা।

শ্মশান পেরিয়ে একটা বাঁক নিতেই দলটা এসে পড়লো একেবারে মালিকের কাছারি বাড়ির কাছে। ওদের দেখে গোবিন্দ তশীলদার দাঁড়ালো সামনে এসে। সকৌতুকে বললে, 'ইদিকে কোথায় গেছলে সব হে—কুটুম বাড়ি?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটির ঘর।'

'ভাল ভাল। তা এখানে সব ডেরা বেঁধে থাকবে তো—নাকি?'

বাগাম্বর এক গাল হেসে মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'বেটি কুটুমের ঘরের কাছে থাকলে মোদের কি আর ইজ্জৎ থাকবে হুজুর। বাগাম্বরের কাছে সেটি হবেনি কখনো। এই মোরা চলে যাচ্ছি।'

'বলো কি হে! আজই চলে যাবে বেটির গাঁ ছেড়ে?' গোবিন্দ বললে, 'থাক এসে মোদের কাছারির অতিথ্‌শালায়—ইজ্জৎ যাওয়ার কোনো ভয় নাই তোমার।' শেষে গোবিন্দ যেন 'হায় হায়' ক'রে বললে, 'কই কেউ আস না তোমরা। তোমাদের পেয়েছি যখন—অন্তত একটা দিন থেকে যাও।'

লোকটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে না পেরে বাগাম্বর তাকিয়ে রইল বোকার মতো।

গোবিন্দ গোরু খেদানর মতো ক'রে নিয়ে চলল সবাইকে। আফসোস করতে লাগল বারবার—এমন সুন্দর কাক-মারারা এ চরে এসে ডেরা বাঁধে না বলে।

কাল থেকে দল প্রায় অভুক্ত। যন্ত্র-চালিতের মতো চলল গোবিন্দর পেছনে পেছনে।

ভোজের হৈ চৈ পড়ে গেল কাছারি-বাড়িতে। তিন-তিনটে চাকর ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে গোবিন্দ চক্কোত্তির ফরমাসে। পুকুরে পড়ল জাল, গাঁজা এলো ভরি ভরি, নিজে তদারক করতে লাগল গোবিন্দ। কাকমারার দল দিব্যি বসে বসে খেতে লাগল শুধু একদিন নয়—পুরো দুটো দিন। চরের চাষাভুসোরা অবাক হল প্রথমে—তারপর কানাঘুষো করতে লাগল এই বলে, 'ও আর কিছু লয়—দলে চেংড়ি যুবতী আছে কটা, তশীলদারের নজর পড়েছে সেই দিকে। শালা চরে এবার কাকমারা বসাবে গো।'

কিন্তু বাগাম্বর গাঁজায় দম দিয়ে দলের লোককে বোঝালে, 'এত খাতির তাদের—শুধু পয়মন্ত সেই বেটির জন্যে।'

দু-দিন তারিখ পেছিয়ে জরিপ-হাকিমের তাঁবুতে ডেপুটেশনের এজলাস বসল তৃতীয় দিনে। এ-দুদিন কি ক'রে যে কেটেছে আন্দির—এ শুধু সেই জানে। ভিটে ছাড়ার হুমকী দিয়ে গেছে গোবিন্দ—যাচ্ছেতাই ক'রে বলে গেছে তার পেয়াদারা। মুখ শুকনো ক'রে নিরুপায়ের মতো ঘুরে ঘুরে গেছে মাগন মণ্ডল। চরের পুরানো প্রজারা দেখিয়ে গেছে কপাল। পাথরের মতো মুখ ক'রে থেকেছে আন্দি। তিন দিনের দিন ছুটল সে তাঁবুতে তিনটে ছেলেকে সঙ্গে ক'রে। তখন বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যে।

মাগন বললে, 'এই হল জগার বউ হুজুর।'

গোবিন্দ খেঁকরে উঠলো, 'বউ না। আর কিছু! জগার রক্ষিতা হুজুর।'

হাকিম জিজ্ঞেস করলে, 'জগার সঙ্গে তোমার বিয়ে-সাদি হয়েছিল?'

গোবিন্দ মহা একটা রসিকতার কথা শুনে যেন খ্যাক খ্যাক ক'রে হেসে উঠলো। বললে, 'কাকমারা মাগীর সঙ্গে সচ্চাষীর বিয়ে-সাদি হুজুর!'

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে আন্দি—যেন এখনও কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না।

গোবিন্দ নিজের চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠাল বাগাম্বরকে। সব তৈরী ছিল গোবিন্দর। বাগাম্বর এসে দাঁড়াল তার অদ্ভুত বেশবাস নিয়ে—মাথায় কাকের পালক গোঁজা, লাল শালুর পাগড়ী, গলায় লাল নীল কাঁচের মালা, হাতে লোহার বালা আর কানে কুণ্ডল।

গোবিন্দ বললে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন হুজুর। ওদেরি জাত।'

হাকিম আন্দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওকে তুমি চেন?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটি, খুব পয়মন্ত বেটি।'—

বাকীটুকু বললে গোবিন্দ—কেমন করে জগা ওই কাকমারার মেয়েকে নিয়ে চরে এসে ঘর বেঁধেছিল, সেই সব কথা। শেষ বললে, 'এরকম একছার হয় হুজুর। উদো চাষাভূসো যেমন ফাঁদে পড়ে তেমন ও মাগীরাও একটা থেকে আর একটার কাঁধে চাপে। সব বেশ্যার শামিল।'

আচ্ছন্ন মগজে এতক্ষণে যেন কথাগুলো ছুরির মতো কেটে বসেছে আন্দির। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো, 'কি বললি হারামের ব্যাটা—আমি বেশ্যা!'

'না তুই সতী নক্ষ্মী।' গোবিন্দ ডাকলে তার নিজের কাছারিবাড়ীর হারাধনকে। জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যি কথা বল ব্যাটা বামুনের সামনে—হুজুর রয়েছেন, কতদিন থেকে যাওয়া-আসা করছিস ওই মাগীটার কাছে?'

হারাধন মাথা নীচু ক'রে বললে, 'জগা মরার মাস দুই পর থেকে হুজুর।'

গোবিন্দ বললে হাকিমকে, 'এই সব ছোটলোকের জাত হুজুর। নোংরা কথা শুনে হয়তো আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

মুখ টিপে হাসল হাকিম সাহেব। তাকাল আন্দির দিকে। দেখতে দেখতে ঘাবড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসেছে ওর যৌবনের বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাস—ওর গভীর কালো চোখে ঝিকিয়ে উঠেছে সেই বেপরোয়া বেদিনী।

কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে একটা বাঘিনীর মত ছুটে গেল সে হারাধনের দিকে। এক লহমায় গিয়ে চেপে ধরল তার গলা ঃ

'হারামির বাচ্চা!'—

হৈ-চৈ করে উঠল গোবিন্দ। হারাধন চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে। ছুটে এল পেয়াদারা। ধরাধরি করে ছাড়িয়ে দিল হারাধনকে। বোকার মত খাপছাড়া ভাবে হাকিমের দিকে চেয়ে আবার চিৎকার ক'রে উঠল আন্দি নিজের তিনটে ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ওরা মোর ব্যাটা—হোই দ্যাখ অবোধ বালকরা মোর। ওরা পাবে না তার বাপের হাঁসিল করা জমিন! বল—বল—আমি ওদের আম্মা! বল মোকে'—

গোবিন্দ ভেংচি কেটে বলল, 'রক্ষিতার বাচ্চা, সে আবার ওয়ারিশ! তোর জাতের দল বসে আছে হোই বাইরে—চলে যা তাদের সঙ্গে।'

'তোকে মেরে ফেলাব—মেরে ফেলাব হারামি'—গর্জে উঠে ছুটে গেল আন্দি গোবিন্দের দিকে।

গোবিন্দ টপ্ করে লাফ দিয়ে হুজুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন হুজুর—ছোট জাতের স্বভাব। বেদিনী হারামজাদী সাক্ষাৎ চামুণ্ডা হুজুর।'

'তোর ভদ্দরলোকের মুখে মারি লাথ!'

এমন সময় বাইরে একটা কলরব পাকিয়ে ওঠে সহসা। বহুদূর থেকে চেঁচাচ্ছে যেন কে ঃ

'আগুন আগুন' ···

কে বললে, 'তোর ঘরে আগুন আন্দি!'—

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল আন্দি। তার পর ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে ছুটল সে তাঁবু ছেড়ে ঘরের দিকে। অন্য দুটো ছেলে কেঁদে উঠল পেছনে ভয় পেয়ে। তারা ছুটল মায়ের পেছনে পেছনে।

চাষীর কুঁড়ে। পুড়ে শেষ হতে আর কতোক্ষণই বা লাগে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আগুন ধরে জ্বলে শেষ হয়ে গেল। কেরোসিন তেল চুম্বকের মত টেনে নিল আগুনকে। দড়ি ছিঁড়ে গরুগুলো পালাল কোথায় বনে বাদাড়ে, দম বন্ধ হয়ে মরে গেল কটা ছাগল, পুড়ে মরে গেল প্রায় সব হাঁস মুরগীগুলো। সেই ছাই ভস্মের পাশে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল আন্দি।

ব্যাপারটার গভীরত্ব বুঝেই বোধ হয় বুড়ো বাগাম্বর গেল সান্ত্বনা দিতে, 'ও সব ঝুটমুটের জন্যে দুখ্ করিসনি বেটি! মোরা কাকমারার জাত! ওরা

যখন তাড়াবেই তো চল মোদের সঙ্গে। দল বসে আছে তোর জন্যে। কেউ যাইনি মোরা—চল।'

...আবার সেই নোওরা-ছেঁড়া জীবন!—

কিন্তু আন্দির চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে আর কথাটি মাত্র না বলে পালিয়েছে বুড়ো বাগাম্বর। ওই ভঙ্গীর পরিচয় সে পেয়েছে এই ক'দিন আগে। আন্দি খাড়া দাঁড়িয়ে রইল একজায়গায়।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা ঢিল এসে টাঁই করে লাগল মেজছেলেটার কপালে। দেখতে দেখতে তাজা রক্তের ধারায় ভেসে গেল তার মুখ। 'আম্মা গো' বলে বসে পড়ল ছেলেটা। তার রক্ত-ধারার দিকে চেয়ে চেয়ে ঝকমক ক'রে উঠল আন্দির পাথর-কালো চোখ দুটো।

মাগন ছুটে এসে তুলে ধরল ছেলেটাকে। আন্দির দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, 'এখনও বলছি—পালা এখন হেথা থেকে আন্দি। মোর ঘরে চল। একটু বেলা হোক।'

'যাব! কেন যাব?' দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে আন্দি বললে, 'কোথায় যাব মোর ব্যাটাদের ভিটে ছেড়ে? ওদের মতো জন্ম দিইনি মোরা এ চরের!'

মাগন কাকুতি করে বললে, 'এখনকার মত শুধু সরে যা হেথা থেকে—আবার কি অঘটন ঘটে যাবে একটা। হাই দ্যাখ শালা ছ্যাঁচড় হারাধন ঘোরাঘুরি করছে।'—

অদূরে একটা ঝুপি জঙ্গলের আড়ালে দেখা গেল ডোরাকাটা সার্ট হারাধনকে—যে সাক্ষী দিয়েছিল আন্দির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে। তাকে দেখে চোখ জ্বলে উঠল আন্দির।

'এসে তাড়াক মোকে গিধ্‌ধোড়ের বাচ্চারা।' বিড় বিড় করে বললে আবার আন্দি, 'মোর মরদের ভিটে, মোর ব্যাটার ভিটে!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—এ তোর ব্যাটারই ভিটে।' মাগন ওর একটা হাত চেপে ধরে বললে, 'এ চরের চাষীরা তা সবাই জানে। তারা বলছে—তোর ব্যাটার জমিই তারা চষে আবাদ করবে। এই পোড়া ভিটেয় আবার ঘর তুলে দেবে। কেউ তাড়াতে পারবে না তোর ব্যাটাদের। ও হাজার লেখা হোক কাগজে কলমে। সবাই বসে আছে মোর দাওয়ায়—চল নিজে শুধোবি। এখন চল তুই এখেন থেকে—হাতে ধরে বলছি তোর—হেথা থেকে সরে যা।'—

অন্ধকার থেকে আবার একটা ঢিল এসে পড়ল এবার আন্দির

গায়ে। চেঁচিয়ে উঠল বুকে জড়ানো ঘুমন্ত কচি ছেলেটা। বোধ করি লেগেছে।

মাগন একটা হাত চেপে ধরল আন্দির 'চল আন্দি—সরে চ'—আর এক দণ্ড হেথা লয়।'

'না।'—

হঠাৎ ফেটে পড়া একটা সবল কণ্ঠ নিস্তরঙ্গ মরা অন্ধকারকে যেন আলোড়িত কম্পিত ক'রে তোলে মুহূর্তে, 'আসুক কে লড়াবে মোকে।'

তিনটে ছেলেকে ঘিরে অটল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল আন্দি—নড়ল না এক পা।

একটা রাঙা আভা ঝলমল করছে অন্ধকারে—সেটা যেন নিভন্ত খড়কুটোর নয়, সে ওই বাঘিনী মেয়েটার রাঙা চোখের আগুন, ওর সর্বাঙ্গের রুদ্ধ দ্যুতি।—

১৯৫৩ ॥ ঘরের ঠিকানা

★

কম্পোজিটার ভূতনাথ

'পাকড়ো···পাকড়ো শালোকো।'···

'ইধার গয়া—আরে উধার এক শালা।'

পুলিস জমাদারের আচমকা আক্রমণে ঘুমে জমাট ওপাড়ার মাঝরাত্রিটা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। বুটপরা পায়ের দ্রুত ছুটন্ত লয়, গলি ঘুঁজিতে ভীত অপসৃয়মান পদশব্দ—আর কোথায় একটা পুলিস ভ্যানের ইঞ্জিনের গর্জন, সবটা মিলে নিঃশব্দ পাড়াটাকে জাগিয়ে দিলে।

তারপর জাগা লোকগুলোকে ঘরের বাইরে টেনে বার করে আনলে এক মহিলার ফাটা কাঁসার মত ভীত আওয়াজ, 'চোর চোর—চোর।'

'মার মার—ধর ধর'-এর হুংকার পড়ে গেল। চোর পাওয়া গেল মিত্তির বাড়ির সদর প্যাসেজের মধ্যে। পাওয়া তো গেল—কিন্তু তাকে টেনে বার করা আর এক সমস্যা। শত কিল চড় ঘুষি খেয়েও সে যেভাবে প্রাণপণে মিত্তিরদের বৈঠকখানার জানালার গরাদ আঁকড়ে ধরে আছে--সেখান থেকে তাকে ছাড়ানো শক্ত। সে কেবলি বলছে, 'যাচ্ছি বাবু যাচ্ছি—পুলিসগুলো চলে যাক।'

'বটে! শোন শোন—ব্যাটার কথা শোন।' নাদু মিত্তির দোতলা থেকে হুংকার দিলে, 'ব্যাটাকে তবে বেঁধে ফ্যাল ওই জানালার গরাদের সঙ্গে। আমি আসছি।'

অতএব আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে গরাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। সে বাধা দিলে না। পুলিস আর ভ্যানের শব্দ যখন দূরে মিলিয়ে গেল এবং চোরটাকেও দড়াদড়ি দিয়ে কায়দা করে ফেলার পর হৈ-হাল্লা যখন একটু কমে এল তখন চোর বললে, 'বাবু আমি চোর লয়। ভগমানের দিব্যি গেলে বলছি।'

নাদু মিত্তির বিপুল দেহভার নিয়ে ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছে। খেঁকিয়ে উঠে বললে,—'না—তুমি বড় কুটুম। ব্যাটা! ব্যাটাকে লাগাও জুতি।'

চোর আবার বিনীতভাবে বললে, 'আজ্ঞে বাড়ি আমার দখনে, ছোট বিষ্টুপুর!'

নাদু মিত্তির চোখ পাকিয়ে বললে, 'বটে!'

'আজ্ঞে জমিদার মোদের জমিটমি সব ভেঁড়ির বাঁধ কেটে ভেসিয়ে দিলে জলে, তাই চলে এলম কলকাতায় কাজের ধান্ধায়,' চোর বললে। 'আগে রাতটায় শুতাম পার্কের বেঞ্চিতে। তা সেখান থেকেও পুলিস তেইড়ে দিলে।'

নাদু মিত্তির গোঁফে চাড়া দিয়ে আবার বললে, 'বটে!'

'আজ্ঞে।' চোর বললে, 'তাই সেখান থেকে গেলম কর্পোরেশনের ওই বাজারের চলায়। সেখানেও তেইড়ে দিলে!'

ওর ওই অবলীলায় মিথ্যা ভাষণ অসহ্য। নাদু মিত্তির রুখে উঠে বললে, 'তারপর?'

নাদু মিত্তিরের বাঁকা জেরার ভঙ্গী চোর বুঝল না বোধ করি। সে আগের মতই সহজ বিনীতভাবে বললে, 'তারপর আজ্ঞে এপাড়ায় ঐ মস্ত বাড়িটার গাড়িবারান্দার তলায় আজকে রাতটার মত মাথা গুঁজে ছিলম।'

'হুম্।' নাদু মিত্তির চোখ পাকিয়ে বললে, 'তারপর?'

'বাপ মা ঘর গিরস্তি সব ছিল বাবু—মোর সব চলে গেল সেই জলের তলায়।—আজ কুত্তার মত'—বলতে বলতে সে কেঁদে ফেললে।

কৌতূহলী মুখের ভিড় শুধু তাকে ঘিরেই নয়, আশপাশের বাড়ির ছাদে জানালায় পর্যন্ত।

কেউ বললে, 'হবে।—দখনের লোকে তো কলকাতা ভরে গেছে হঠাৎ।'

কেউ বললে, 'ছোঁড়ার বয়স কত হবে—উনিশ কি কুড়ি, কিন্তু শয়তানী ধাপ্পা দেখেছ!'

চোর নাদু মিত্তিরের দিকে চেয়ে হাউমাউ করে বলে উঠল, 'আমি একটা কথাও বানিয়ে বলিনি বাবু। মাথা গোঁজার ঠাঁই দিন একটু—আর যা হোক একটা কাজ।'

হঠাৎ দক্ষিণের মেয়ে-মরদ, কাচ্চা-বাচ্চায় ভরে গেছে কলকাতা এবং তারা যে ভবঘুরে, ধরা পুলিসের তাড়া খেয়ে খেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে—একথাও সত্যি। চোরের মুখে লেগে আছে এখনো গ্রাম্য কৈশোরের সারল্য একটা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নাদু মিত্তির। সেকেলে ভদ্রলোক তিনি। চাকরকে হুকুম দিলে, 'দে ব্যাটার দড়ি খুলে।' ঘরে চোরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললে, 'যা বললি সব সত্যি?'

'আজ্ঞে ভগমানের দিব্যি।'

'কাজকর্ম দিলে করবি?'

ঝপ্ করে নাদু মিত্তিরের পা ছুঁয়ে সে বলল, 'এই দিব্যি গেলে বলছি—কাজ করব, যা বলবেন।'

'ঠিক আছে।' নাদু মিত্তির বড় মেয়ে মণির দিকে চেয়ে বললে, 'তোর তো একজন লোকের দরকার ছিল—নিয়ে যা ওকে।'

মণি তাকাল ঘাবড়ানো চোখে।

নাদু মিত্তির চোরের দিকে চেয়ে বললে, 'একটু ইদিক-উদিক করো যদি বাছাধন—তা হলে একদম জেলে। বুঝলি? বড় জামাই আমার খোদ জেলের ডাক্তার।'

'আজ্ঞে।'

'কি নাম তোর?'

'ভূতনাথ।'

পরেরদিন নাদু মিত্তিরকে একটা গড় করে ভূতনাথ চলে গেল মণির সঙ্গে।

জেল-ডাক্তার তারিণী দত্ত। জেল থেকে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তার কোয়ার্টার। সেই কোয়াট্রারে মণির সঙ্গে ভূতনাথ এল কাজ করতে।

মণি গজ গজ করতে করতে বললে, 'বাবার মুখের সামনে কিছু আমি বলতে পারলুম না। এখন এই চোর না ছ্যাঁচড়—একে নিয়ে কি করবে কর।'

তারিণী বলল, 'বেশ তো—ওকে এনেছ যখন, তোমার কাজ করুক না কিছু দিন।'

'তারপর কিছু নিয়ে সটকে পড়ে যদি?'

'বটে!' তারিণী ডাকল, 'এই ভূতনাথ।'

'আজ্ঞে।' ভূতনাথ সামনে এসে দাঁড়াল।

তারিণী ডাক্তার সিধে সামনের আঙুল তুলে বললে, 'ওই যে মস্ত লাল বাড়িটা, ওটা কি জানিস?'

'আজ্ঞে!'

'জেলখানা। বজ্জাতির মতলব থাকলে একেবারে সিধে ওইখানে ভর্তি করে দেব কাজে।'

ভূতনাথ পাণ্ডুর মুখে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

তারিণী বলল, 'যা এখন কাজে।'

কাজে চলে গেল ভূতনাথ।

মুখ বুজেই কাজ করে চলল সে দিনের পর দিন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই দেখা গেল—সারা দুপুরটা সে কোথায় উধাও হয়ে যায়, ফিরে আসে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। মণি আরও লক্ষ্য করল—এই দুপুরটায় বেরুবার জন্যে সারা সকালটা সে যেন ছটফট করে, ঘরের কাজ টেনে যায় দু'হাতে। কিন্তু কত কাজ করবে সে? কাজের চাপ বাড়িয়ে দিলে মণি। কিন্তু সে কাজ পড়ে রইল তেমনি।

একদিন কষে ধমকে দিল মণি কিন্তু সে আর শোধরাল না। ভূতনাথ তেমনি বেরিয়ে যেতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত মণি চটে একদিন কথাটা তুলল তারিণী ডাক্তারের কাছে, 'হারামজাদা ছিঁচোর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল পথে পথে—এখন খেতে পরতে পেয়ে ওর কাণ্ড দ্যাখ।'

'কি করেছে?'

'সারা দুপুর কোথায় যায়—কাজ পড়ে থাকে এদিকে।'

আসামী কাছে-পিঠেই কোথায় ছিল—শুনেছে সব কথা। তাকে কিছু বলবার আগেই সে তারিণীকে ঢিপ করে একটা গড় করে বলল, 'আমাকে ছুটি দিন বাবু।'

'ছুটি! তোর বাড়িঘর কোথায় যে ছুটি নিয়ে যাবি?'

'আজ্ঞে কাজ থেকে ছুটি চাইছি। এ কাজ আর ভাল লাগছে না আমার!'

'বটে! কি কাজ তবে ভাল লাগে তোর?'

'একটা প্রেসে কাজ শিখছি বাবু—কম্পোজের কাজ। দেশের লোক আছে একজন—তার কাছে কাজ শিখছি।'

'বটে! লেখাপড়া জানিস তুই?'

'বাংলা একটু-আধটু জানি বাবু।'

'হু।'

আর কি বলবে তারিণী।

ঢিপ ঢিপ করে দুজনকে দুটো গড় করে ভূতনাথ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মন দিয়ে কম্পোজিটারের কাজ শিখতে লাগল ভূতনাথ। গুরু তার দেশের লোক হরিপদ। কোন সংবাদপত্রের প্রেসে কাজ করে সে। প্রথম

দিকটায় তার চা-বিড়ি আর গ্যালি বয়ে বয়ে শেষ পর্যন্ত হাতে খড়ি হলো ভূতনাথের। মুখস্ত করল অক্ষরের খুপরি, একদিন হাতে নিয়ে বসল কম্পোজের স্টিক। হাতও চলল আস্তে আস্তে—কিন্তু তার চেয়ে তার চোখ আর মন চলল আরও জোরে। কখনো বা হাত রইল একেবারে অচল। ভূতনাথ পড়ে চলল তো পড়েই চলল কি লেখা আছে খবরটুকুতে।

হরিপদ শুধরে দিয়ে বলল, 'পড়বিনি—খবর্দার পড়বিনি। তুই দেখবি শুধু অক্ষর। আ-কার, ই-কার, চ-কার ব-কার। পড়ার শখ থাকলে পড়িস কাগজ ছাপা হওয়ার পর।'

কিন্তু ওই দোষটা আর কাটিয়ে উঠতে পারল না ভূতনাথ। চোখ তার শুধু অক্ষর দেখে না—দেখে আরও বড় কিছু, অক্ষরের পর অক্ষর সাজানো কথার মানে। তারই টানে কোথায় টানা হয়ে যায় সে।

সেই টানে বলে উঠল একদিন সে, 'হেই দ্যাখ হরিপদ্দা, মস্কোর খবর।'

জ্বলে উঠল হরিপদ। কম্পোজের স্টিকটা হাত থেকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠাস করে কসিয়ে দিলে এক চড়। বললে, 'শালা কম্পোজিটার না এডিটার এলেন—যা শালা দোতলায় বাবুদের ঘরে। শালা 'মস্কো' পড়তে বলেছি তোকে! বললাম না তুই দেখবি ম-কার, এ-কার, আস্ক, া-কার, তো শালা পড়ল মস্কো! যা ভাগ—তোকে দিয়ে কম্পোজ হবে না।'

ভূতনাথ করুণ ভাবে বললে, 'কি করি দাদা, পড়ে ফেলি যে! মনে করি পড়ব না, কিন্তু শালার—'

হরিপদ বললে, 'পড়ার কাজ আমাদের নয়—আমাদের কাজ গড়ার···যারা পড়ে, তাদের জন্যে। মনে রাখবি—আমরা কম্পোজিটার।'

'এবার আর ভুল হবে না দাদা। দ্যাখো।' ভূতনাথ বললে, 'কথাটা বলেছ জোর গো—পড়ার কাজ আমাদের না, কাজ হল গড়ার।'

কিন্তু ভুল তার হবেই। আবার একদিন সে কম্পোজ করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল, 'চীন যে এসে গেল ভারতের কাছে হরিপদ্দা! এই শোন খবরটা—আচ্ছা, এমন তো আমাদের দেশেও ঘটতে পারে। গরীব চাষী মজুর'—

'শালা'—হরিপদ তেড়ে গেল, 'শালা আমার চাকরি খাবি।'

গুরুর রুদ্রমূর্তি দেখে সেই যে ছুটে পালাল ভূতনাথ—আর ফিরে এল না।

সময়টা ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি। গোটা পৃথিবীর আবহাওয়াটা পরিবর্তনমুখী। সম্পূর্ণ হতে চলেছে চীনের বিপ্লব—তার উত্তাল তরঙ্গ গিয়ে

লাগছে দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বীপে দ্বীপান্তরে, নড়ে উঠছে সাম্রাজ্য ও শোষণের ভিত। নড়ে উঠছে অনেক মানুষের মন। চঞ্চল হয়ে উঠছে মানুষের বুকের ভেতরের আশা ও স্বপ্ন।

এই সময়ে একদিন সস্ত্রীক তারিণী ডাক্তার মোটরে করে যাচ্ছিল এক বড় রাস্তার চৌমাথা দিয়ে। মণি হঠাৎ রাস্তার মোড়ের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'এ সেই ভূতনাথ না ?'

'হুঁ, কম্পোজিটার ভূতনাথই যে দেখি !' তারিণী ডাক্তার মৃদু হেসে বললে।

ভূতনাথ একখানা খবরের কাগজ উঁচিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল ওদের গাড়ী লক্ষ্য করে, 'এই যে নতুন খবর—দুনিয়া বদলে গেল ! চীনের বিপ্লব—ইন্দোনেশিয়া, বার্মা ··· ভিয়েৎনাম···'

তারিনী বললে, 'কি হে কম্পোজিটার ভূতনাথ, শেষ পর্যন্ত কাগজ বিক্রি !'

'ও চুপচাপ মাছি-মারা কাজ ভাল লাগল না ডাক্তারবাবু—' বলে সে আবার চেঁচাতে লাগল, 'এই যে পূর্ণ হল চীনের বিপ্লব। এই যে বর্মায়—'

সব হকারেই চেঁচায়, ভূতনাথ যেন সবার বাড়া। ব্যবসার চেয়ে উৎসাহটা তার প্রচুর। কোথায় কোন দেশের বিপ্লব তরঙ্গ তুলেছে তার তাড়া-খাওয়া ভবঘুরে স্নায়ুতে।

সময়টা বড় থমথমে। একটা ঝড়ো হাওয়া যেন পুঞ্জিত হয়ে উঠছিল ভারতবর্ষের আনাচে কানাচেও।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল—ভূতনাথের পাত্তা আর সে মোড়েও নেই। কলকাতার কোথাও নেই। ছোকরা কোথায় চলে গেল কে জানে। আবার নতুন যে কি ভাল লাগল তার।

বছর খানেক পরের কথা। সময়টা মৌসুমীর। বর্ষার রাত্রি। মাঝরাতে বেজে উঠল একদিন জেলের ভেতরে পাগ্‌লা ঘণ্টি। তারিণী ডাক্তার ঘুম ভেঙে উঠে বসল ধড়মড় করে।

মণি জিজ্ঞেস করলে, 'কি ব্যাপার।'

'গুরুতর বলেই মনে হচ্ছে।' তারিণী বললে, 'দিন কয়েক হল—বুনো মোষের মত কতগুলো চাষাকে ধরে এনেছে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে, সব খুনে ডাকাত।'

'ডাকাত ?'

'তারও বাড়া ! ধান লুট করেছে, জমিদার মেরেছে, জোর করে দখল করেছে জমি। সব এক একটা মড়াখেকোর মত। কোন একটা খুন-খারাপির ব্যাপার বাধিয়েছে হয়ত ব্যাটারা। সেদিন দেখি, এক ব্যাটা কাঁদছে হাউ-মাউ করে মৌসুমী মেঘ দেখে। বলে—এ মরশুমে ফাঁকে পড়ে গেল আমার জমি। তাকে আবার তুমি জান। কে বল দেখি ?'

'কে ?'

'সেই যে সেই ভূতনাথ কম্পোজিটার গো !'

'ওই বন্দুকের শব্দ !'—

'আবার !'—

বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়া শিউরে শিউরে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে বন্দুকের আওয়াজে।

তারিণী উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তৈরি হই—যেতে তো হবে এখুনি।'

কিছুক্ষণ বাদে ফোনে ডাক এল ডাক্তারের। ডাক্তার বেরিয়ে গেল জেল-হাসপাতালের উদ্দেশে।

দল নয়—শুধু একজন এসেছে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হাসপাতালের বারান্দায়, কাঁদছে ফুলে ফুলে বেড়ি পরা দু'হাতে মুখ গুঁজে। আস্তে আস্তে কান্না তার যেন জমাট স্তব্ধ হয়ে আসছিল।

তারিণী ডাক্তার শুধাল, 'কি হল ?'

'শালা সুন্দরবনের জানোয়ার ··· ভেগে যাচ্ছিল !' ওয়ার্ডার জবাব দিলে। ধমকে উঠল ফোঁপান লোকটার ওপরে, 'এই শালা, রোতা কাহে !'

কান্নার শেষ রেশটুকুও শেষ হয়ে আসছিল—ধমকে তাও থেমে গেল।

তারিণী শুধোলে, 'গোলী জখম ?'

'জরুর। শালা গির পড়া। একদম পিঠে বিঁধেছে।'

'তবে তো কাম ফতে রে।'

মুখ গোঁজা লোকটা তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে যেন মুখ তুলে তাকাল তারিণী ডাক্তারের গলা শুনে। অস্ফুট কণ্ঠে পরম আগ্রহে বলে উঠল, 'ডাক্তারবাবু বাঁচান—'

তারিণী ডাক্তার ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপরে, 'আরে, ভূতনাথ কম্পোজিটার না !'

ভূতনাথ শেষবারের মত মাথা নেড়ে শুধু বললে, 'না—মোর জমি—'

হরিপদ কম্পোজিটার একদিন বলেছিল—তারা পড়ার জন্যে গড়ে। কম্পোজিটার ভূতনাথের স্থির স্তব্ধ চোখের তারায় অক্ষর ও শব্দের অতীত সেই কি একটা মস্ত বড় স্বপ্নের গড়ন যেন কঠিন জমাট হয়ে গেল আস্তে আস্তে। কে জানে জেল-ডাক্তার তা পড়তে পারল কি না।

চিরদিনের কাহিনী ॥ ১৯৫৯